দাওয়াহ ও জিহাদ সম্পর্কিত কিছু প্রশ্নোত্তর, ফতওয়া এবং সংশয় নিরসন

সূচিপত্রঃ

১। খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি সম্পর্কে একটি প্রশ্ন

২। আমাদের এলাকায় জামাতে ইসলামী বাংলাদেশের কিছু ভাই আছেন। তারা মনে করেন তারাও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন। কিন্তু যতদূর আমি জানি তারা সঠিকপথে কাজ করছেন না। তাদেরকে আমি কি বলে দাওয়াহ দিবো?

৩। হিজবুত তাহরীর এর সদস্যরা মনে করেন খিলাফত কায়েমের আগে কোন জিহাদ নেই, দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য নুসরাহ খুঁজতে হবে এবং তারা এটাকেই একমাত্র পথ মনে করেন। এ ব্যাপারে ইসলামের ভাষ্য কি?

৪। ডঃ আসাদুল্লাহ আল গালিব সাহেব, যিনি আহলে হাদিস আন্দোলনের আমির। তিনি তার বই এ উল্লেখ করেছেন 'এই যুগের কলমের জিহাদই মূল জিহাদ', এ ব্যাপারে উনার দৃষ্টিভঙ্গি কি ইসলাম সম্মত?

৫। আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার পর মুসলমানদের উপর শরীয়তের বিধান

৬। নফসের জিহাদ বড় জিহাদ !!

৭। জিহাদের জন্য পিতা-মাতার অনুমতি শর্ত কিনাঃ

৮। জিহাদের জন্য একজন সর্বজনীন খলীফা বা বিশ্বনেতা থাকা কি শর্ত, নাকি স্থানীয়ভাবে আমীর নিয়োগ করে জিহাদ করা যায়?

৯। খিলাফা আলা মিনহাযিন নুবুওয়া ছাড়া জিহাদ করা যায় কিনা?

১০। রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়া জিহাদ করা যায় কিনা?

১১। দাওয়াহ এর ক্ষেত্রে অনুসরনীয়

১২। আমি কেন আল-কায়িদাকে বাছাই করলাম?

১। খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি সম্পর্কে একটি প্রশ্নঃ

প্রশ্নঃ

সালাম আলাইকুম। আপনার বক্তৃতা থেকে আমি যা বুঝলাম তা হলো, আপনি বিশ্বাস করেন খিলাফা পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া হলো জিহাদ। আপনার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবেন কি?

আরেকটি মত এখন উম্মাহর কাছে তুলে ধরা হচ্ছে তা হলো, "শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং সামরিক সংগ্রামের মাধ্যমে ইসলামকে বিশ্ব দরবারে ফিরিয়ে আনা। আবার এই মতবাদ একটি নির্দিষ্ট হাদিসের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি ঈমাম মুসলিম সহ আরো অনেক সূত্র থেকে বর্ণিত যে, নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তির (শাসকের) বিরোধীতা করো না যতক্ষণ পর্যন্ত না তার মধ্যে প্রকাশ্যকুফরী পাওয়া যায়, যা আল্লাহ থেকে(ইসলাম থেকে) সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত হয়…' ইবনে কাসীর (রঃ) তাঁর তাফসীরে বলেছিলেন যে, যদি খলিফা কুফরী শাসনে ফিরে যায়, তবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও শরীয়তের দিকে ফিরে যায়।

ইবনে হাযারও (রঃ) তাঁর ফাতহুল বারিতে উল্লেখ করেছেন যে, যদি সে (অর্থাৎ খলিফা) কাফির হয়ে যায় বা শরীয়ত পরিবর্তন করে, তবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে এবং তাকে উৎখাত করতে হবে। এই মত নাইল আল-আওতারেও উল্লেখ করা হয়েছে এবং ঈমাম শাওকানী (রঃ) এটি সমর্থন করেছেন। সুতরাং, যদি শাসক শরীয়ত ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা শাসন করে তবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে হয় তওবা করে অথবা তাকে উৎখাত করা হয়। যাই হোক, শুধুমাত্র সেই পরিস্থিতিতেই এটি প্রয়োগ হবে; অর্থাৎ যে খলিফা কুফরী আইন প্রবর্তন করে ও আল্লাহর অবাধ্য হয়, তার ক্ষেত্রেই কেবল এই বিধান প্রযোজ্য হবে। এটি সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না যখন খলিফা অত্যাচারী এবং দুর্নীতিবাজ হবে। তবুও তার আনুগত্য করতে তারা বাধ্য এবং মুসলিমদের তার পিছনে নামাজ পড়া ও জিহাদ করা উচিত।

যাই হোক, এই হাদীসগুলো বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য নয়। এইগুলো খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং এই হাদীসগুলো যে শিরোনামে এসেছে তা হল 'খুরুজ মীন আল-খলীফা' (অর্থাৎ খলীফা বা ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ)।

বর্তমান পরিস্থিতি এমন নয় যে, খলীফারা এতদিন ইসলামী অনুশাসন চালাতেন এবং এরপর ইসলাম থেকে ফিরে গেছেন। বর্তমান সমস্যা এমনও নয় যে, শাসককে নিছক হত্যা করে সরাতে হবে। বরং দীর্ঘ ৭৬ বছরেরও বেশী সময় ধরে মুসলমানরা পরিপূর্ণভাবে কুফরী ব্যবস্থার (সিস্টেম) উপর আছে; না কোন শাসক কখনো শরীয়ত দ্বারা শাসন করেছে, না কেউ খিলাফা রাষ্ট্রের খলীফা। যে সিস্টেম তারা প্রয়োগ করে আসছে তা গণতান্ত্রিক কাঠামোর আদলে হয় রাজতন্ত্র অথবা পুঁজীবাদ। তথাপি বাস্তবতা এই নয় যে, ইসলামী রাষ্ট্র থেকে খারাপ খলীফা অপসারণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বাস্তবতা হচ্ছে, এদের শাসকবর্গ সহ সমস্ত কুফরী সিস্টেমের মূলোৎপাটন করে দারুল ইসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। বর্তমান শাসকবর্গ কোনভাবেই সেই খলীফার সাথে তুলনীয় নয়, যে কিনা খিলাফা রাষ্ট্রে একটি কুফরী আইনের সূচনা করেছেন। কাজেই এই হাদিসগুলো, যেগুলো সবসময়ই দারুল ইসলামের(অর্থাৎ, যেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত ও মুসলিমরা নিরাপদ) প্রেক্ষাপটে বুঝানো হয়েছে, সেগুলো বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করা যাবেনা। যেদিকে তারা নির্দেশ করছেন বাস্তবে তাহল ইসলামী রাষ্ট্রে কুফরি বিধান প্রবর্তনকারী খলীফার অপসারণ। শাসকের বিরুদ্ধে সার্বিক লড়াই ও তাকে হত্যার মাধ্যমে একটি পরিপূর্ণ কুফরী সিস্টেমের মূলোৎপাটন এর বাস্তব নির্দেশ নয়।

দলীল-প্রমাণ থেকে একমাত্র এই পরিস্থিতির সাথে যা তুলনীয় তাহলো -রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দ্বারা একেবারে গোঁড়া থেকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এবং সেটি প্রতিষ্ঠা করতে ও দারুল কুফরকে দারুল ইসলাম এ পরিবর্তন করতে তাঁর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সংগ্রাম সেটিই। এই সংগ্রামের কথা তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

বর্ণনা করেছেন হামজার হাদিসে, যা পাওয়া যায় সুন্নাহ ও সীরাহ গ্রন্থগুলোতে। যেহেতু পূর্ণ কুফরী সিস্টেম থেকে পূর্ণ ইসলামী সিস্টেমে রুপান্তরের সেটিই একমাত্র উদাহরণ; সেহেতু এখনকার বিষয়টিও নিছক শাসক নয় বরং সিস্টেমের পরিবর্তনের সাথেই সম্পৃক্ত। জিহাদের এই হাদিসটি শুধুমাত্র শাসক (অর্থাৎ বিপথগামী খলীফা, সিস্টেম নয়) পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আর মক্কায় রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সংগ্রাম ছিল সিস্টেম পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত। তাই সামরিক তৎপরতা (বা সংগ্রাম) খিলাফা পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া নয়।" – এরই সাথে কি আপনি হিজব উত-তাহরির সম্পর্কেও আপনার মতামত জানাবেন? জাযাকাল্লাহ খায়ের। সালাম আলাইকুম।

উত্তরঃ

খিলাফা পতনের পর প্রতিষ্ঠিত বেশীরভাগ ইসলামিক দলই খিলাফা পুনঃপ্রতিষ্ঠার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয়। আশির দশক ও নব্বই দশকের দিকে এমন এক সময় ছিল যখন সালাফি'রা, ইখওয়ান, জামায়াত ইসলামি, হিজবুত তাহরির, জিহাদী দলগুলো এবং সুফীদের অনেকেই খিলাফার কথা বলতো। যেহেতু পশ্চিমা বিশ্ব পরিষ্কার করেছে যে, তারা এটি (অর্থাৎ খিলাফাত) পছন্দ করে না ও বরদাস্ত করবে না, সেহেতু তখন থেকেই কিছু দল খিলাফার কথা বলা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিল এবং অন্যরা চুপসে গেল। শুধুমাত্র গুটি কয়েক দল ইসলামি অনুশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার আহবানে দৃঢ় রইল।

খিলাফা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে ইসলামী দলগুলোর প্রস্তাবিত পদ্ধতি সমূহঃ

১। তারবিয়াহ্ এর মাধ্যমে এবং পরে যখন কোনভাবে আমাদের পরিস্থিতির পরিবর্তন আসবে খিলাফা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। যখন অন্যরা বলে আমরা তারবিয়াহ চালিয়ে যাবো যতক্ষণ পর্যন্ত না উম্মাহ প্রস্তুত হয় এবং তারপর আমরা আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করব।

২। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায় গিয়ে।

৩। হিজবুত তাহরিরের পদ্ধতি হল খিলাফার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উম্মাহর সচেতনতা বৃদ্ধি করা, মুসলিমদের রাজনীতি শিক্ষা দেয়া এবং নুসরাত (আনসারদের থেকে সাহায্য/সহায়তা) খোঁজা।

৪। আল্লাহর দীন (অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করা।

প্রথম পদ্ধতির প্রবক্তারা উম্মাহকে কখনোই কোন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করে দেন নাই যে, কখন আমরা যথেষ্ট পরিমাণ (অর্থাৎ সেই মাত্রা পরিমাণ) তারবিয়াহ (নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে শিক্ষা) সম্পন্ন করে বাস্তবায়নের ধাপে অগ্রসর হতে পারি। এর ফলে আমরা জিহাদের দ্বায়িত্ব উপেক্ষা করে চিরস্থায়ী তারবিয়াহ্‌র ধাপেই পড়ে থাকব।

তাঁরা আরেকটি বিষয় ছেড়ে দেন আর তা হল, তারবিয়াহ এক প্রজন্মের মধ্যে একাধিক প্রজন্মে নয়। মানে হচ্ছে, যে পরিবর্তন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এনেছিলেন, যা দাওয়াহ দিয়ে শুরু হয়ে জিহাদের মাধ্যমে শেষ হয়েছিল তা সম্পন্ন হয়েছিল এক প্রজন্মের জীবদ্দশায়। এর সম্পূর্ণটা সম্পন্ন হয়েছিল ২৩বছরের মধ্যে। তাছাড়া উম্মাহর অন্য সব সফল পরিবর্তন এক প্রজন্মের মধ্যেই ঘটেছিল। ইতিহাস এর সাক্ষী।

গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিবর্তনের প্রবক্তারা এই কথা বলে শুরু করেন যে, গণতন্ত্র কুফর এবং আমরা এতে বিশ্বাস করি না, কিন্তু আমরা এটিকে ক্ষমতায় যাওয়ার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করছি এবং আমরা ক্ষমতায় যাওয়ার পর ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবো। এ কথাই আমি শুনছি ৮০'র শেষ ও ৯০'র শুরু পর্যন্ত ইখওয়ানের প্রত্যেক নেতৃস্থানীয় সদস্য থেকে। আমার পরিষ্কার মনে আছে সেই গণ-আলোচনার কথা যা ঘটেছিল এই বিষয়ের উপর, কারণ তখন সালাফীরা এই পয়েন্টে ইখওয়ানের ঘোর বিরোধী ছিল। আমার এও স্পষ্ট মনে আছে ইখওয়ানের কয়েকজন শাইখের সাথে আমার সেই একান্ত আলোচনার কথা যেখানে তাঁরা বারংবার বলছিলেনঃ গণতন্ত্র অনৈসলামীক এবং আমরা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি, কিন্তু

আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে এর (অর্থাৎ গণতন্ত্রের) মধ্যে থেকে সিস্টেমের পরিবর্তন করা।

এই পদ্ধতির মধ্যে তিনটি সমস্যা আছেঃ

প্রথমতঃ গণতন্ত্রকে ব্যবহার করা এবং গণতান্ত্রিক সিস্টেমের অনুগামী বলে দাবী করা কিন্তু তাতে বিশ্বাস না রাখা – এটি একটি প্রতারণা ও মিথ্যাচার । এখন শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতারণা গ্রহণযোগ্য, যদি মুসলমানরা তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। সমস্যাটা হল, এই বিশেষ দলগুলো যারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত; বিশ্বাস করে না যে তারা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত আছে, বরং বিশ্বাস করে যে, মুসলমান ও কাফেরদের মাঝে চুক্তি আছে। সুতরাং যদি আমরা কাফেরদের সাথে চুক্তিবদ্ধ থাকি তাহলে তাদের(কাফেরদের) সাথে প্রতারণা করা গ্রহণযোগ্য নয় এবং মিথ্যা বলাও গ্রহণযোগ্য নয়। এটাই হচ্ছে প্রথম সমস্যা।

পরবর্তী সমস্যা হল, আপনি যখন একটি মিথ্যাকে যথেষ্ট পরিমাণ দীর্ঘ সময় ধরে পুনরাবৃত্তি করবেন তখন শেষ পর্যন্ত আপনি তাই বিশ্বাস করবেন। যারা এইসব দলগুলোকে ৮০'র দশক থেকে দেখেছিলেন, সময়ের সাথে এইসব দলগুলোর যে কি পরিমাণ পরিবর্তন ঘটেছে তা দেখে তাদের কাছে এটা বিস্ময়কর লাগে। এখন তারা বলছে এবং আমিও তাদের বিশিষ্ট সদস্যদের কাছ থেকে বহুবার শুনেছি যে, "এখন আমরা আসলেই গণতান্ত্রিক সিস্টেমে বিশ্বাস করি। আমরা বুলেট নয় ব্যালটে বিশ্বাস করি। এবং যদি ব্যালট একটি ধর্মনিরপেক্ষ অথবা কাফের দলকে জয়ী করে তাহলে আমরা তাই গ্রহণ করবো।"!

মুসলমান হিসাবে আমাদের ইসলামকে মানুষের খামখেয়ালীর বিষয় বানানো উচিত না যে, যদি তারা এটি(অর্থাৎ ইসলাম/ইসলামী শরীয়াহ) বেছে নেয় আমরা তা বাস্তবায়ন করব, আর যদি তা না করে তবে আমরা জনসাধারণের পছন্দ মেনে নিব। আমাদের অবস্থান এই যে, আমরা পৃথিবীতে তলোয়ারের ডগা দিয়ে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করব; জনসাধারণ এটি পছন্দ করুক বা না করুক। আমরা শরীয়াহ শাসনকে জনপ্রিয়তার প্রতিযোগিতার বিষয় বানাবো না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "আমাকে তলোয়ার সমেত পাঠানো হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত না একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উপাসনা করা হয়।" এই পথই রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পথ, যে পথ আমাদের অনুসরণ করা উচিত।

চূড়ান্ত সমস্যা হল, মুসলমানদের প্রক্রিয়া, অনুপ্রবেশের প্রক্রিয়া নয়। মুসলমানরা ওই(গণতন্ত্র) সিস্টেমে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে না এবং তার মধ্যে থেকে কাজও করে না। এটি আমাদের পথ না। এটি ইহুদী ও মোনাফেকদের পথ, কিন্তু মুসলমানদের পথ না। আমরা বন্ধু ও শত্রুর সাথে সৎ ও অকপট(বা অক্রূর)। আমরা আমাদের উদ্দেশ্য উন্মুক্ত রাখি এবং আমরা প্রকাশ্যে আমাদের দাওয়াহ ঘোষনা করি, "তোমার জন্য তোমার দ্বীন আর আমার জন্য আমার দ্বীন।" আমরা এই(গণতান্ত্রিক) সিস্টেমে অনুপ্রবেশ করতে চাই না, হোক তা আমেরিকায় অথবা কোন একটি মুসলিম দেশে। ইহুদীরাই একমাত্র সকল সরকার ব্যবস্থায়(যার অধীনেই তারা ছিল) অনুপ্রবেশ করেছে, হোক তা আল-আন্দালুস (ইসলামিক স্পেন) ও ওসমানীয় খিলাফা অথবা আজকের পশ্চিমা সরকারসমূহ। তাদের(ইহুদীদের) গোপন বিষয়বস্তু আছে, আমাদের(মুসলমানদের) নাই। ইহুদী ও তাদের দোসর মোনাফিকরা রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সরকার ব্যবস্থায় অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করেছিল এবং কুরআন দ্বারা তাদের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছিলঃ

"এবং এক দল কিতাবধারী [একে অপরকে] বলাবলি করছিল, মুমিনদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, দিনের শুরুতে তা বিশ্বাস কর আর দিনের শেষে তা অস্বীকার(বা পরিত্যাগ) কর, যাতে তারা(অর্থাৎ মুমিনরা) ফিরে যায় [অর্থাৎ, তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করে]"

সুতরাং তাদের পরিকল্পনা ছিল যে, তারা মুমিনে পরিণত হবে এবং মুসলিমদের মাঝে আসবে, শুধুমাত্র দিন শেষে তা পরিত্যাগ করার জন্য। আল্লাহ মোনাফেকদের বিষয়েও বলেছেন যে, তাদের পরিকল্পনা ছিল যে, তারা মুমিনদের সাথে বসবে এবং যা শুনবে তা ইহুদীদের নিকট পৌছে দেবে।

সুতরাং, যারা বলে আমাদের এই (গণতান্ত্রিক) সিস্টেমের সাথে থেকে এটিকে পরিবর্তন করা উচিত তারা মুসলমানদের পথ অনুসরণ করছে না এবং যদি চারিত্রিকভাবে তারা মুসলিম হয়ে থাকে, তবে তারা ব্যর্থ হবে। কারণ অনুপ্রবেশ মুসলিম আচরণের সাথে খাপ খায় না। কিন্তু যদি তারা এই(গণতান্ত্রিক) সিস্টেমে অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম(বা সফল) হয়, তাহলে তা প্রমান করে যে, তাদের চরিত্র ইহুদী বা মোনাফেকদের চরিত্রে পরিনত হয়েছে, মুসলমানদের চরিত্রে নয়।

একটি বিষয় এর সাথে সম্পর্কিত আর তা হচ্ছে, যারা ইসলামী পরিবেশ থেকে উঠে এসেছে এবং দীর্ঘ সময় ধরে বর্তমান রাজনৈতিক সিস্টেমের মধ্যে কাজ করেছে তারা শেষ পর্যন্ত রাজনীতিবিদে পরিণত হয়েছে, যাদের প্রক্রিয়ায় রয়েছে কূটনৈতিক, রঙ-বদল, বস্তুবাদী ও কৌশলী ইত্যাদি শব্দের সকল নেতিবাচক অর্থসমূহ। তারা হয়তো ইসলামী আন্দোলনের শক্ত তারবিয়াহ কর্মসূচির মধ্যে পালিত হয়েছিল, কিন্তু কিছুদিন পর রাজনৈতিক অঙ্গনে তারাই নেকড়েতে পরিণত হয়েছে, যাকে তারা পরিবর্তন করতে চেয়েছিল। আমি এইসব আমার নিজ চোখেই দেখেছি যা আমার পরিচিত মানুষদের ক্ষেত্রে ঘটেছে এবং ইয়েমেন ভিত্তিক ইসলামী আন্দোলনের এক নেতা বলেছেনঃ “আমরা তাদেরকে ভেড়া হিসাবে নেকড়েদের জগতে পাঠাই একটি কঙ্কাল সাবাড় হিসাবে ফেরত পেতে।” আপনি যদি জীবন্ত উদাহরণ চান; এটি দেখতে যে, সিস্টেমের(গণতান্ত্রিক সিস্টেমের) মধ্যে থেকে কাজ করলে তার ফলাফল কি হয়, তাহলে সুদান ও তুর্কির চেয়ে বেশী দূর তাকানোর দরকার নেই। দুই দেশেরই ক্ষমতাসীন দলগুলো ইসলামীক আন্দোলন দিয়ে শুরু করে শেষ পর্যন্ত অন্য সবার মতো পঁচা ও দূষিত পরিবেশে গিয়ে শেষ হয়েছে ।

হিজবুত তাহরীরের প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে যা আপনি আপনার প্রশ্নে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, আমি প্রথম হিজবুত তাহরীরের সদস্যদের সংস্পর্শে আসি ৯০’র শুরুতে জর্ডানে এবং তারা বেশ তর্কপ্রবণ কিন্তু শিষ্টাচার সম্পন্ন ও ভদ্র। হিজব সম্পর্কে আমি প্রথম জেনেছিলাম তাদের কাছ থেকেই এবং তারা ছিল এই দলের কেন্দ্রীয় সদস্য। উম্মাহকে খিলাফা সম্পর্কে সজাগ করতে হিজবুত তাহরীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তারা আরো ভূমিকা রেখেছে, রাজনীতি ও রাজনৈতিক সচেতনতার সেই ভুল মতবাদ প্রতিহত করতে যা ইসলামের সাথে সম্পর্কিত না। যাই হোক, খিলাফা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় হিজবুত তাহরীরের পদ্ধতি কাজ করবেনা। যতক্ষণ পর্যন্ত নুসরাহ না আসে ততক্ষণ নুসরাহর জন্য অপেক্ষা করা – একটি অলৌকিক ঘটনার জন্য অপেক্ষা করা। গোত্রগুলো ও সামরিক প্রধানরা নুসরাহ দিবে আর আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করবে, সোজা-কথায় তাদের আলোচনার মাধ্যমে জয় করা যাবে না। তারা শুধুমাত্র তখনই বিজীত হবে যখন তারা দেখবে, এক দল মুমিন তারা যা বলে তাই করে এবং তাদের সমস্ত অর্জন উৎসর্গ করে আল্লাহর রাহে। এটাই, যা অন্যদের অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করবে। এই দ্বীনকে নুসরাহ দেয়া ক্ষমতাবান ব্যাক্তিদের দু’টি সফল কাহিনী হল, ইরাকি বাথ রেজিমের কিছু প্রাক্তন অফিসাররা যারা বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল এবং দুদাইয়েভ, চেচনিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, যে সোভিয়েত সেনার উচ্চ মর্যাদার অফিসার ছিল। নুসরাহর এই উভয় সফল উদাহরণ কোন বিতর্ক, বিক্ষোভ ও পুস্তিকার মাধ্যমে অর্জিত হয় নি, বরং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে লিপ্ত মুজাহিদিনদের জীবন্ত উদাহরণ দেখেই অর্জিত হয়েছে।

এটি আমাকে খিলাফা পুনঃপ্রতিষ্ঠার চতুর্থ পদ্ধতির দিকে ধাবিত করেছে এবং তা হল জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর মাধ্যমে। আপনি এর বিরুদ্ধে যে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন তা হল, আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতির অনুরূপ যে রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রথমে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং পরে জিহাদ করেছেন। আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য উপেক্ষা করছেন আর তা হল, যখন রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদিনা প্রতিষ্ঠা করেন তখন কোন আক্রান্ত ইসলামিক ভূখন্ড ছিল না। এটা কি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান পার্থক্য নয়?[১]

আজ মুসলিম বিশ্ব বেদখল এবং আমাদের আলেমদের বিবৃতি স্পষ্ট যে, মুসলিম ভূমি মুক্ত করতে প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন। যখন কোন কিছু ফরযে আইন হয় তখন তা ফরযে আইনই। আপনি তা অন্যথায় অনুমান বা ব্যাখ্যা করতে পারবেন না। এর নিয়ম সুস্পষ্ট এবং এর প্রয়োগও সুস্পষ্ট। সুতরাং, আপনার যদি জিহাদকে খিলাফা প্রতিষ্ঠার পন্থা বলে বিশ্বাস নাও হয়, তবে আপনি এ বিষয়ে একমত যে জিহাদ ফরযে আইন, যেখানে হিজবুত তাহরির একমত না। আর যে জিহাদ ফরযে আইন এবং যা জিহাদ আল-দাফা (অর্থাৎ আত্মরক্ষামূলক জিহাদ) তাতে অংশগ্রহণের জন্য ইমাম/নেতা, অভিভাবক, স্বামী, ক্রীতদাসের মালিক বা ঋণদাতার অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হয় না।

আবার বাস্তব জগতে এর প্রমাণ দেখার পরও কেনই বা আমরা এই বিষয়ে তর্ক করি। দুইটি সর্বাধিক সফল (যদিও তা নিখুঁত হওয়া থেকে অনেক দূরে) উদাহরণ হল, গত দশকের আফগানিস্থানের তালেবান ও সোমালিয়ার ইসলামী আদালত। উভয় আন্দোলনই ক্ষমতায় গিয়েছে নির্বাচন বা তর্কের মাধ্যমে নয়, বরং জিহাদের মাধ্যমে। তাদের(অর্থাৎ, পরাজিতদের) পতন এজন্য হয় নি যে, তারা বিফল ছিল, বরং এই উম্মাহই তাদের পরাজয়ের ব্যবস্থা করেছে। অধিকন্তু, যদিও এখানে-সেখানে একটি দু'টি খণ্ডযুদ্ধে পরাজয় এসেছে, তবুও যুদ্ধ এখনো শেষ হয় নি। যদি আপনি সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর দিকে তাকান এবং মনোযোগ সহকারে খেয়াল করেন, তাহলে অনুধাবন করতে পারবেন যে, শত্রুরাই রক্তাক্ত হয়ে মরছে, মুসলমান যোদ্ধারা না। অতি শীঘ্রই সংখ্যা কোটিতে দাঁড়াবে।

কারণ, সাধারণ বিভ্রান্তি যে জিহাদ বলতে কি বুঝায়, নফসের জিহাদ নাকি তলোয়ারের জিহাদ? আমি একচেটিয়াভাবে একটি বা অপরটিকে বুঝাচ্ছি না, এবং একটি থেকে অন্যটি পৃথকও করছি না। আমি জিহাদ বলতে যা বুঝাচ্ছি তা এই নয় যে, অস্ত্র ধরো ও যুদ্ধ কর। জিহাদ এর চাইতেও বৃহত্তর কিছু। আমি এই প্রসঙ্গে জিহাদ বলতে যা বুঝাচ্ছি, তা হল যুদ্ধ চালিয়ে যেতে ও শত্রুকে পরাভূত করতে এই উম্মাহর সামষ্টিক প্রচেষ্টা। রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করো তোমার জান, তোমার সম্পদ ও তোমার মুখ দ্বারা।" ক্লসউইজ এটিকে "সামষ্টিক যুদ্ধ" আখ্যা দিয়েছে কিন্তু ইসলামীক নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে। এটি যুদ্ধক্ষেত্রে একটি যুদ্ধ এবং মানুষের হৃদয় ও মনেরও একটি যুদ্ধ।

সৌজন্যে আনোয়ার আল আওলাকি ডট কম

টীকাঃ

[১] সম্মানিত শায়খ যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য এখানে নিয়ে এসেছেন তা হল – শরীয়ত তখনও পরিপূর্ণ ছিলনা, কিন্তু এখন পরিপূর্ণ। এজন্য আমাদের সীরাহ থেকে ফিকহ বোঝা জরুরী, যদি হুবুহু সীরাহ অনুসরণ করা হয়, তাহলে আসলি কাফেরদের (যেমন- হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ) কাছে আমাদের নুসরাহ চাওয়া জরুরী – যা এখন কেউ করবে না। এই প্রসঙ্গে উমর (রা) এর একটি কথা উল্লেখযোগ্য –

ইবনে ইসহাক (র) থেকে বর্ণনাটি করেছেন, তাবী নাফি(র) থেকে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে, যার মাঝে পাওয়া যায় –

উমর (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বালক। যেদিন তিনি (উমর) ইসলাম কবুল করেন সেদিন কুরাইশ কাফেরদের সাথে তাঁর মারামারি হয়। তিনি প্রহৃত হন এবং প্রহার করেন। এক পর্যায়ে তিনি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েন তখন তিনি তাদেরকে বলেন,

"তোমাদের যা ইচ্ছে তাই কর। আল্লাহর কসম, আজ যদি আমরা তিনশজন হতাম, তাহলে হয় মক্কায় তোমরা থাকতে, না হয় আমরা থাকতাম।"

(সীরাত ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, উমর (রা) এর ইসলামের উপর দৃঢ়তা)

(আর-রাহিকুল মাখতুম, উমর (রা) এর ইসলাম গ্রহণ)

কাজেই, এটা পরিষ্কার যে, রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবারা (রা) যদি মক্কায় যথেষ্ঠ পরিমাণ ই'দাদ/প্রস্তুতির কাজ করতে পারতেন তাহলে তাঁরা হিজরতও করতেন না, বা মক্কার বাইরে কাফেরদের কাছে নুসরাহ চাইতেন না। সুতরাং, হিজবুত তাহরিরের ভাইয়েরা যদি মনে করেন রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সকল

কাজের অনুসরণ করতে হবে ফিকহকে বাদ রেখে, তাহলে উনাদের প্রয়োজন ছাড়াই হিজরত করা উচিত এবং আসলি কাফেরদের (যেমন- হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ) কাছে নুসরাহ চাওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে, যে কোন কাজ আমাদের করা উচিত কুরআন ও হাদিসের ফিকহ অনুসরণের মাধ্যমে, বিচ্ছিন্ন একটি হাদিসের অনুসরণের মাধ্যমে নয়।

আল্লাহ এখন আমাদের উপর হিন্দু/ খ্রিস্টান/বৌদ্ধদের কাছে নুসরাহ চাওয়াকে ফরয করেন নি। তবে হিজরতের পরে মদীনায় রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর অবতীর্ণ আয়াতটি আমাদের মনে রাখতে হবে –

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو اكُونوا أَنصَارَ اللَّهِ

হে ঈমানদাররা! তোমরা আল্লাহর আনসার হয়ে যাও। (সূরা সফঃ ১৪)

কাজেই আমাদের মুসলমানদের নিজেদের উচিত আনসার হওয়া এবং অন্য মুমিন-মুসলমানদের আনসার হওয়ার প্রতি আহবান জানান। আর একটি সিস্টেমকে পরিবর্তনের জন্য (শুধু আগ্রাসী কাফেরদের ক্ষমতা থেকে সরানো না) ই'দাদের সময় আমাদের আনসার তৈরী করতে হবে। এরকম সিস্টেম পরিবর্তনের জন্য যে ধাপগুলো আমরা পাই সেগুলো হল – যেমনটা, আমরা শাইখ আযযামের বক্তৃতা থেকে পাই –

হিজরত (যদি প্রয়োজন হয়), ই'দাদ (প্রস্তুতি), রিবাত (পাহারা ও গুপ্ত হামলা) এবং কিতাল (সশস্ত্র যুদ্ধ)।

২। আমাদের এলাকায় জামাতে ইসলামী বাংলাদেশের কিছু ভাই আছেন। তারা মনে করেন তারাও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন। কিন্তু যতদূর আমি জানি তারা সঠিকপথে কাজ করছেন না। তাদেরকে আমি কি বলে দাওয়াহ দিবো?

উত্তরঃ

ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু।

ইন্নাল হামদা লিল্লাহ, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসুলিল্লাহ।

এই সাইটের ব্যাপারে ভালো মন্তব্য করার জন্য আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যার নিয়ামতে সমস্ত ভাল কাজ সংঘটিত হয়ে থাকে। দোয়া করবেন যেন আল্লাহর দিকে আহবানের ক্ষেত্রে এই সাইট যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ব্যাপারে কিছু বলার আগে আমরা একটি কথা পরিষ্কার করে নিতে চাই। তা হলোঃ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও মতের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভংগী।

প্রথমতঃ মানবরচিত বিভিন্ন মতবাদের ধ্বজাধারী দলসমূহ যেমনঃ আওয়ামীলীগ, বিএনপি, জাতীয়পার্টি ইত্যাদি যারা আল-কোরআন ও সুন্নাহ বিরোধী আইন অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করছে এবং এটাই তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এরা নিকৃষ্ট শিরক ও কুফরে লিপ্ত। এরা কুফরের দল। এদের নেতৃবৃন্দ হচ্ছে তাগুত।

দ্বিতীয়তঃ ইসলামী রাজনৈতিক দলসমূহ যারা ইসলামী রাস্ট্র / খিলাফত প্রতিষ্টা করতে চায়। এইসব দলসমূহের মূল লক্ষ্য হলোঃ দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করা কিন্তু তারা কিছু কিছু ভুল-ভ্রান্তিতে লিপ্ত। এমনকি তাদের কোন কোন ভুল শিরক-কুফর পর্যন্ত পৌঁছেছে। আল্লাহ যেন তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেন।

জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য ইসলামী রাজনৈতিক দলের ব্যাপারে আমাদের কথা হলোঃ আমরা তাদের সম্বন্ধে এটা বলি না যে, তারা শুধু ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য রাজনীতি করছেন কিংবা তারা দ্বীনকে শুধুমাত্র ক্ষমতায় যাওয়ার একটা উসিলা হিসেবে ব্যবহার করছেন। বরং আমরা মনে করি, তারা আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য, বাংলাদেশকে ইসলামী রাস্ট্রে পরিবর্তন করার নিয়্যতে কাজ করছেন। পাশাপাশি আমরা তাদের যেসব ভালো কাজ আছে সেগুলিও স্বীকার করি। যেমনঃ তাদের সহচর্যে থেকে অনেকে আল-কোরআন ও হাদিসের বাংলা অনুবাদ পড়ছেন। অনেকে নামাজ, রোযা করছেন ইত্যাদি।

কিন্তু সত্যকে সত্য হিসেবে আর মিথ্যাকে মিথ্যা হিসেবে তুলে ধরতে আমরা বাধ্য, তা না হলে ইলম গোপন করার অপরাধে আমরা কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে অপরাধী হয়ে যাবো। এছাড়াও তাদের প্রতি সত্যিকার কল্যাণকামিতা হলো তারা যেসব ক্ষেত্রে আল-কোরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী আচরণ করছেন, সেসব ক্ষেত্রে তাদের ভুলগুলি ধরিয়ে দেয়া। আর এটাই আয়না হিসেবে এক মুসলমান আরেক মুসলমানের জন্য করার কথা। তাছাড়া যেসব কোরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী আচরণ তারা প্রকাশ্যে করছেন, সেসব আচরণ প্রকাশ্যে তাদেরকে ধরিয়ে দেয়াই ইসলামের দাবী। যেভাবে ভুল নামাজ আদায়কারীকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনঃ

ارجع فصل فإنك لم تصل

“ফিরে যাও, তারপর (আবার) নামাজ পড়ো, কারণ তুমি নামাজ পড়ো নি”। (সুনান আবু দাউদ, শুয়াবুল ঈমান, মুসনাদে আহমাদ)

এখানে নামাজের বিরোধিতা উদ্দেশ্য নয় বরং নামাজকে যাতে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়, সেটাই ছিলো উদ্দেশ্য। অনুরুপভাবে, আমাদের উদ্দেশ্য দ্বীনকে বিজয়ী করার প্রচেষ্টার বিরোধিতা নয়, বরং যাতে সঠিক পথে দ্বীনকে বিজয়ী করার চেষ্টা করা হয়, সেই দিকে মনযোগ আকর্ষণ করা।

আমরা আল্লাহকে এই ব্যাপারে সাক্ষী রেখে বলছি যে, তাদের ইসলাহ ও কল্যাণ ছাড়া আমরা আর কিছু চাই না, আমরা চাই তারা যেন পরিপূর্ণ কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে দ্বীনকে বিজয়ী করার কাজ করেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর পছন্দনীয় পথে এবং ইসলামী শারীয়াতের গন্ডির ভিতরে থেকে দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করার কাজ করার তৌফিক দান করুন।

তাদের যে সব কাজ আমাদের কাছে আল-কোরআন ও সুন্নাহ বিরোধী মনে হয়েছে, তার মাত্র তিনটি আমরা নীচে তুলে ধরছিঃ

ক) প্রথমতঃ জামায়াত ইসলামী ও অন্যান্য ইসলামী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ পশ্চিমাদের থেকে ধার করা কুফরী গণতন্ত্রকে দ্বীন ক্বায়েমের পদ্ধতি হিসেবে বেছে নিয়েছেন। যে গনতন্ত্রের মাধ্যমে এম.পি বা সংসদ সদস্যদের আল-কোরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন প্রণয়নের অধিকার দেয়া হয় যা সুস্পষ্ট শিরক এবং কুফর। কারণ আল্লাহতায়ালাই একমাত্র আইন-বিধানদাতা। ভাল নিয়্যতে কোন কুফরী পথ অবলম্বন করলে তা জায়েয হয়ে যায় না বা এর গুনাহ থেকেও অব্যাহতি পাওয়া যায় না।

তারা এদেশের কুফর-শিরকের মিলনস্থান জাতীয় সংসদের সদস্যপদ গ্রহণ করে আল-কোরআন ও সুন্নাহ বিরোধী আইন প্রণয়নে শরীক থেকেছেন যা একটি বড় কুফরী যা একজনকে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। এই ‘শিরকের আখড়া’ – সংসদ ভবনে সদস্যপদ নেয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক কাজে বড় শিরক ও বড় কুফর রয়েছেঃ

যেমনঃ সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেবার সময় এই দেশের কুফরী সংবিধানকে সম্মান ও মান্য করার শপথ নিতে হয়।

THIRD SCHEDULE; [Article 148]; OATHS AND AFFIRMATIONS

“I, ……., having been elected a member of Parliament do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully discharge the duties upon which I am about to enter according to law: That I will bear true faith and allegiance to Bangladesh: And that I will not allow my personal interest to influence the discharge of my duties as a member of Parliament.

http://www.pmo.gov.bd/pmolib/constitution/schedule3.htm

অর্থঃ “আমি, ……, সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে শপথ করছি যে, আমার উপর আইনের মাধ্যমে অর্পিত দায়িত্বসমূহ বিশ্বস্থতার সাথে পালন করিবো, আমি বাংলাদেশের প্রতি সত্যিকার বিশ্বাস ও অনুগত্য পোষণ করিবো, আমি আমার ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য সংসদ সদস্য হিসেবে আমার উপর অর্পিত কর্তব্যকে প্রভাবিত করবো না”।

এই শপথে দেখা যাচ্ছে যে, এদেশে প্রচলিত ব্রিটিশ-কুফরী আইন অনুযায়ী সকল দায়িত্ব পালন করার শপথ নেয়া হচ্ছে। আর সেই দায়িত্বের মধ্যে আছেঃ সংসদে বসে সবাই মিলে আইন রচনা করা। আর এই কুফরী সংবিধান অনুযায়ী সেটা যে কোন

আইন হতে পারে, আল-কোরআন ও সুন্নাহ বিরোধীও হতে পারে। বরং এই কুফরী সংবিধানের ৭(২) ধারায় বলা আছেঃ

"জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।"

অর্থাৎ এই সংবিধান অনুযায়ী আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেয়া আইনও বাতিল হয়ে যাবে, যদি তা এই সংবিধান বিরোধী হয়। এর চেয়ে বড় কুফরী-শিরকী কথা আর কি হতে পারে!!! আর এটা সুস্পষ্ট যে, কেউ যদি কোন কুফরী আইনকে সম্মান করার ও মান্য করার শপথ নেয়, সেটাও একটা কুফরী কাজ।

এছাড়াও এই কুফরী সংসদে যে সব আইন প্রণয়ণ হয়, সে সবে জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য ইসলামী রাজনৈতিক দলের এমপিরা শরীক থাকেন না বরং বিরোধিতা করেন বলে দাবী করলেও বাস্তবে তারা একটি কুফর সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ "সংসদ" এর অংশ হয়ে পুরো সিস্টেমকে সমর্থন করছেন। কারণ একটি দেশের সরকারের মূলত তিনটি অংশঃ সংসদ (Legislative) , প্রশাসন (Executive) ও বিচার বিভাগ (Judiciary)। তারা এই সংসদের সদস্য হয়ে পূর্ব থেকে চলে আসা কুফরী-শিরকী আইনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে সাহায্য করছেন। এই সেই সংসদ যারা আগের সংসদ সমূহের মাধ্যমে চলে আসা শিরক ও কুফরের ধারাবাহিকতা রক্ষা করছে। আর এই সংসদের সদস্য হওয়া মানে আগের রচিত সমস্ত শিরক-কুফরী আইনের বোঝা নিজের কাঁধে নিয়ে নেয়া। কারণ যদি এই সংসদ না থাকে, তাহলে দেশে তাদের কথা অনুযায়ী 'সাংবিধানিক শূন্যতা' সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ তাদের এই শিরক-কুফরী আইনের ধারাবাহিকতা রক্ষার করার জন্য এই সংসদও জরুরী। আর অন্যান্য কুফরী দলের সাথে যোগ দিয়ে সেই জরুরী কাজটাই আঞ্জাম দিচ্ছেন জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য ইসলামী দলের এমপিবৃন্দ। আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াত দান করুন।

এছাড়াও তারা বিভিন্ন পার্লামেন্টারী কমিটির সদস্য হয়েছেন, যেগুলো পরিচালিত হয় সেই কুফরী ব্রিটিশ আইন অনুযায়ী। একজন ঈমানদার, আখিরাতে বিশ্বাসী মুসলমান যা কখনো মেনে নিতে পারে না।

খ) জামায়াত ইসলামী এর নেতৃবৃন্দ মুরতাদ সরকারের দুইটি মন্ত্রণালয় মানব-রচিত কুফরী আইন অনুযায়ী পরিচালনা করেছেন, যা একটি বড় কুফর – যা একজনকে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। আর এই ব্যাপারে আয়াত তারা নিজেরা তাদের কর্মী, সাথী, রোকনদেরকে মুখস্থ করিয়ে থাকেন। আল্লাহ বলেছেনঃ

إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

আমি তওরাত অবতীর্ন করেছি। এতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে। আল্লাহর আজ্ঞাবহ পয়গম্বর, দরবেশ ও আলেমরা এর মাধ্যমে ইহুদীদেরকে ফয়সালা দিতেন। কেননা, তাদেরকে এ খোদায়ী গ্রন্থের দেখাশোনা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং তাঁরা এর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। অতএব, তোমরা মানুষকে ভয় করো না এবং আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াত সমূহের বিনিময়ে স্বল্পমূল্যে গ্রহণ করো না, যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের। (সূরা আল মায়েদা, আয়াতঃ ৪৪)

আর জামায়াতে ইসলামীর এই নেতৃবৃন্দ সমাজ-কল্যাণ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় কিংবা কৃষি মন্ত্রণালয় তো ইসলামী শরীয়াহ আইন অনুযায়ী পরিচালনা করেন নি। বরং তারা তা পরিচালনা করেছেন মানব-রচিত কুফরী-ব্রিটিশ আইন অনুযায়ী।

শিল্প মন্ত্রনণালয়ের অধীন শিল্প ব্যাংক তখনো সুদের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়েছে, অর্থাৎ এই মন্ত্রী আল্লাহর সাথে যুদ্ধে এই মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিচালিত হয়েছে কুফরী আইনে, সেখানে বিভিন্ন এনজিওকে শিরক-কুফর-ফাহেশা ছড়িয়ে দেয়ার অবকাশ দেয়া হয়েছে, লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। সেখানে শত শত এনজিওকে সুদ ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি সহ লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। আর এসব হয়েছে সমাজ-কল্যাণ মন্ত্রীর দায়িত্বে, তার নিয়ন্ত্রণে।

এসবই পরিস্কার কুফর। কারণ এটাই হচ্ছে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তা ছাড়া অন্য কোন বিরোধী আইনে বিচার-ফায়সালার বাস্তব দৃষ্টান্ত। হাফিজ ইবনে কাসীর (রঃ) তাঁর তাফসীরে সূরা আল মায়িদাহ এর ৫০ নম্বর আয়াতের তাফসীরে বলেছেনঃ

“আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সেই সব লোকদের ইনকার করেছেন যারা সেই শরীআহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়; যা মানুষের জন্য উপকারী; যা মন্দকে নিষেধ করে। আল্লাহ সেই সব লোকদের প্রত্যাখ্যান করেছেন যারা নিজের প্রবৃত্তির অনুসরন করে যারা কুফরের আইনকে গ্রহণ করে যেমন তাতারদের আইন যা তাদের রাজা চেংগিস খানের অধীনে বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। ঐসব আইনগুলো ছিল ইহুদী, খ্রীষ্টান এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুযায়ী রাজাদের তৈরি করা আইনের মিশ্রন। আমরা কি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আইনের পরিবর্তে ঐসব আইনগুলোকে প্রাধান্য দিব? যে এই কাজটি করে সে কাফের এবং তাকে হত্যা করা ওয়াজিব!” – তাফসীর ইবনে কাসীর।

আল্লাহ জামায়তে ইসলামী ও অন্যান্য ইসলামী রাজনৈতিক দল যারা সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন, তাদেরকে যেন হেদায়েত দান করেন।

গ) জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য ইসলামী রাজনৈতিক দলের অগণিত কর্মী বিগত নির্বাচনসমূহে জোটবদ্ধ নির্বাচনের দোহাই দিয়ে অধিকাংশ আসনে বিএনপির জন্য মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ভোট প্রার্থনা করেছেন, যা একটি বড় কুফরী যা একজনকে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

এটা জানা কথা যে বিএনপি / আওয়ামীলীগের আদর্শ হচ্ছে কুফরী আদর্শ – যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সাঃ) এর বিরোধিতার উপর দাঁড়িয়ে আছে। যেমনঃ বিএনপি এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে তাদের দলীয় সংবিধানে বলা আছেঃ

“(c) To acquire pro-people economic development and national progress based on social justice through politics of production, free market economy and people’s democracy.”

অর্থঃ “সামাজিক সুবিচারের ভিত্তিতে উৎপাদনের রাজনীতি, মুক্ত বাজার অর্থনীতি ও জন-গণতন্ত্রের মাধ্যমে জন সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক উন্নতি ও জাতীয় অগ্রগতি অর্জন”।

সুত্রঃ bangladeshnationalistparty-bnp.org

অর্থাৎ, তারা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও জাতীয় উন্নতি সাধন করতে চায় “মুক্ত বাজার অর্থনীতি ও জন-গণতন্ত্রের”মাধ্যমে, ইসলামী অর্থনীতি কিংবা ইসলামী শরীয়াহ এর প্রয়োগের মাধ্যমে নয়। আর এটা হচ্ছে সুস্পষ্ট কুফরী একটি আদর্শ। এখন কেউ যদি সেই বিএনপিকে ভোট প্রদান করার জন্য আহবান করে, সে পরিণামে কুফরের দিকে আহবান করে।

যদিও জামায়াতে ইসলামীর সদস্যরা মুখে মুখে ‘ইসলামী গণতন্ত্র’ নামক এক আজব বস্তুর কথা বলেন কিন্তু বাস্তবে পশ্চিমা আবিষ্কৃত কুফর-শিরক মিশ্রিত গণতন্ত্রের মাধ্যমে দ্বীনকে বিজয়ী করার দিবা-স্বপ্ন দেখছেন এবং বিএনপি এর জন্য বাংলাদেশের অধিকাংশ আসনে ভোট চেয়েছেন। এটাই কি তাদের তথাকথিত ‘ইসলামী গণতন্ত্র’? এটাই কি তাদের তথাকথিত ‘হালাল গণতন্ত্র’? এসবের পরও কিভাবে বিবেক সম্পন্ন একজন মানুষ গণতন্ত্রের পক্ষে সাফাই গাইতে পারেন?

আর এটা জানা কথা যে, নিয়্যত ভালো থাকলেও ইসলামে কোন হারাম কাজ করার অনুমতি নাই। যেমনঃ কেউ চুরি করে সেই টাকা গরীব ও অভাবীদেরকে দান করতে চাইলে সে গুনাহগার হবে। আর কুফরী আইন অনুযায়ী মন্ত্রনালয় পরিচালনা কিংবা কুফরী কোন দলের জন্য মানুষের কাছে ভোট চাওয়াতো বলাই বাহুল্য। এসব কাজ কখনো অযুহাত হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবার এসব কাজকে 'হিকমাহ' বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা আরো জঘন্য। কারণ সকল নবী-রাসুল (আঃ) হিকমাহ অবলম্বন করেছেন। আর তাফসীর গ্রথসমূহে 'হিকমাহ' শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'সুন্নাহ'। জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য ইসলামী রাজনৈতিক দলের এসব আল-কোরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কাজ তথা শিরক-কুফরকে 'হিকমাহ' বলার অর্থ হচ্ছে সকল নবী-রাসুল (আঃ) বিভিন্ন সময় শিরক-কুফরীতে লিপ্ত হয়েছেন। *নাউজুবিল্লাহ।*

তবে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি। তাদের মাঝে এসব শিরক-কুফর থাকলেও আমরা তাদের অজ্ঞতা ও তাওয়ীলের (ভুল ব্যাখ্যা) কারণে তাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে কাফির মনে করিনা। আমাদের উপরুক্ত আলোচনার মানে এটা নয় যে, পুরো জামায়াতে ইসলামীকে আমরা তাকফির করছি।

আপাতত জামায়াতে ইসলামীর এই ভুলগুলি তুলে ধরলে আশা করি আপনার এলাকায় উল্লেখিত ভাইরা সত্য বুঝতে পারবেন। এই ভাইদেরকে এটা বুঝানো দরকার যে, আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ব্যতীত কোন কিছু কবুল করেন না। আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার প্রচেষ্টা একটা ভালো কাজ, বরং তা ফরজ। যেহেতু এটা একটা ইবাদত, তাই সেই ইবাদাতের পদ্ধতি স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। এই দ্বীন প্রতিষ্টার নির্দেশ দানকারী এর পদ্ধতির ভিখারী নন, যে তিনি আব্রাহাম লিংকন কিংবা কোন কাফিরের কাছে এর পদ্ধতি ভিক্ষা চাইবেন।

কিন্তু এই দ্বীনকে বিজয়ী করতে গিয়ে কোন হারাম কিংবা শিরক-কুফরে জড়িত হবার কোন অবকাশ নেই। যে এরকম করবে সে শুধু পরিণামে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। আর আল্লাহ শুধু ঈমানদারদের জন্য বিজয়ের ওয়াদা করেছেন যারা আমলে সালেহ করবে।

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। (সূরা নূর, আয়াতঃ ৫৫)

কিন্তু যারা শিরক-কুফরীতে লিপ্ত হবে, তারা তো আমলে সালেহ করছে না বরং তারা আজাবের সম্মুখীন হবে। তাই আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার চেষ্টা করতে হবে জিহাদ ও ক্বিতালের মাধ্যমে যা আমরা সংক্ষেপে 'আমাদের দাওয়াহ' পাতায় উল্লেখ করেছি। সেখানে আমরা দেখিয়েছি যে, এ ব্যাপারে আলেমদের ইজমা আছে যে, কোন এলাকার শাসকের মাঝে প্রকাশ্য কুফরী দেখা দিলে তাকে অপসারণ করা ফরজ। আর যদি অপসারণ করার সামর্থ না থাকে, তবে সেই সামর্থ অর্জন করা ফরজ। আর সেটা সম্ভব না হলে হিজরত করে সেই এলাকা ত্যাগ করা ফরজ।

আল্লাহ আমাদেরকে সবাইকে সত্য উপলব্ধি করার তৌফিক দান করুন। ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। সত্য পৌঁছে দেয়া ছাড়া আমাদের কোন দায়িত্ব নেই।

৩। হিজবুত তাহরীর এর সদস্যরা মনে করেন খিলাফত কায়েমের আগে কোন জিহাদ নেই, দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য নুসরাহ খুঁজতে হবে এবং তারা এটাকেই একমাত্র পথ মনে করেন। এ ব্যাপারে ইসলামের ভাষ্য কি?

উত্তরঃ

ইন্নাল হামদা লিল্লাহ, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসুলিল্লাহ।

আল্লাহ আপনাকে অনেক কল্যাণ দান করুন, দ্বীনের বিজয়ের জন্য আপনি চিন্তা করছেন এবং কোন পদ্ধতিতে দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করা যায়, এই ব্যাপারে আপনি পড়ালেখা করছেন। আল্লাহ আপনাকে ও আমাদের সবাইকে সঠিক পদ্ধতিতে দ্বীনকে বিজয়ী করার কাজে শরীক থাকার তৌফিক দান করুন।

হিজবুত তাহরীর একটি ইসলামী জামায়াত যারা আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য কাজ করছেন। আলহামদুলিল্লাহ, তারা অন্যান্য অনেক দলের মতো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার শিরকে জড়িত হননি। এবং তারা কোন মানবরচিত কুফরী পদ্ধতি থেকে নয় বরং ইসলামী শরীয়াত থেকে দ্বীনকে বিজয়ী করার পদ্ধতি আহরণ করার চেষ্টা করেন।

যা হোক তাদের এই দাবী, 'খিলাফত কায়েমের আগে কোন জিহাদ নেই' – এটা সঠিক নয়। তাদের পূর্বে সলফে সালেহীনদের কেউ এমন দাবী করেছেন, এর প্রমাণ তারা দেখাতে পারবেন না।

জিহাদ দুই প্রকারঃ আক্রমণাত্বক ও প্রতিরক্ষামূলক। আক্রমণাত্বক জিহাদের জন্য একজন খলিফা থাকার কথা আলেমরা আলোচনা করেছেন, কিন্তু প্রতিরক্ষামূলক জিহাদে খলিফার কোন শর্ত সলফে সালেহীন ও পূর্ববর্তী আলিমদের কেউ আলোচনা করেন নি। কারণ যখন একটি মুসলিম এলাকা কাফিরদের আগ্রাসনে মুখে পড়ে, যখন কাফিররা তা দখল করে নেয়, সেখানে জিহাদ করা ফরজে আইন হয়ে যায়। সেখানে খলিফার উপস্থিতিকে শর্ত করা একটা অযৌক্তিক দাবী।

তাদের এই যুক্তি মূলতঃ একটা বিষয়ের উপরে দাঁড়িয়ে আছে, তা হলোঃ রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কায় থাকতে জিহাদ করেন নি। কিন্তু তাদের এই যুক্তি বাতিল, কারণঃ

– যখন রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কায় ছিলেন, তখনো শরীয়াত পূর্ণতা পায় নি। যেমনঃ তখনো মদ কিংবা সুদ হারাম হয়ে যায় নি।

– তখনো জিহাদের আদেশ নাজিল হয় নি। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কায় থাকতে জিহাদ ফরজ হয় নি।

আর তারা যদি এই কথার মাধ্যমে এই দাবী করে থাকেন যে, মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধে যাওয়া যাবে না খলিফা ছাড়া, তাহলে সেটাও বাতিল। কারণ সেটা পূর্ববর্তী উলামাদের ইজমার পরিপন্থী, যে ইজমা আমরা 'আমাদের দাওয়াহ' পাতায় উল্লেখ করেছি।

আর তাদের দাবী 'নুসরাহ খোঁজা বর্তমানে দ্বীনকে বিজয়ী করার একমাত্র পদ্ধতি' – এটার পক্ষে কোন দলীল-প্রমাণ নেই। এটা তাদের ধারনা মাত্র। আর ধারনা-অনুমান সত্যের বিপরীতে কোন কাজে আসে না। তারা এমন কোন দলীল-প্রমাণ দেখাতে পারবেন না যেখান থেকে প্রমাণ হয় নুসরাহ খোঁজা হচ্ছে দ্বীনকে বিজয়ী করার একমাত্র পদ্ধতি। বরং এই ব্যাপারে তাদের মাঝে বেশ কিছু ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয় যা আমরা সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করছি ইনশাআল্লাহ। তারা দাবী করেন,

আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির মিল রয়েছে শুধুমাত্র রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মক্কী যুগের সাথে। তাই দ্বীনকে বিজয়ী করার প্রচেষ্টা করতে হবে শুধুমাত্র রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে পদ্ধতিতে বিভিন্ন গোত্রের কাছে নুসরাহ খুঁজেছিলেন, সেই পদ্ধতিতে। কিন্তু তারা এটা লক্ষ্য রাখতে ভুলে যান যে, আমাদের পরিস্থিত এবং মক্কী যুগের পরিস্থিতির মধ্যে অনেক ব্যবধান রয়েছে। যেমনঃ

– এখন দ্বীন এবং শরীয়াত পূর্ণতা লাভ করেছে, আর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মক্কী যুগে যখন তিনি নুসরাহ খুঁজেছিলেন, তখনো দ্বীন পূর্ণতা লাভ করেনি। তাই ঐ সময়ের হুকুম আর আমাদের সময়ের হুকুম এক হবে না।

– রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মক্কী যুগে তখনো জিহাদের অনুমতি আসেনি, আর সকল ফিতনাহ দূর করার আগ পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার হুকুমের কথাতো প্রশ্নই আসেনা। আর এখন এসব হুকুম আমাদের সামনে রয়েছে। ঠিক যেমনভাবে মক্কী যুগে সুদ হারাম হয় নি, বরং তা মাদানী যুগে হারাম হয়। যখন সুদ হারাম হয়েছিলো, সেটা এমন এক অবস্থা ছিলো যখন রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘোষণা করেছিলেন,

من ترك مالا فلأهله ومن ترك ضياعا فإلي

“যে ব্যক্তি কোন সম্পদ রেখে মারা যাবে, সেটা তার পরিবারের, আর যে ব্যক্তি ঋণ রেখে মারা যাবে, তার দায়িত্ব আমার উপর”।

কিন্তু এখন আমাদের কাছে সকল হুকুম মজুদ আছে, তাই সুদ আমাদের উপর হারাম যদিও এখন ইসুলামী হুকুমত প্রতিষ্টিত নেই, যদিও আমাদের অবস্থা মক্কী যুগের সাথে অধিক সামঞ্জস্য রাখে।

– রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন কাফির গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহন করার মাধ্যমে তাদের কাছে নুসরাহ খুঁজেছিলেন। আর এই ভাইরা নুসরাহ খুঁজছেন বিভিন্ন মুরতাদ সেনাবাহিনীর কাছে।

– রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সময় উনি এবং সাহাবাগণ (রাঃ) ছিলেন, একমাত্র মুসলমান। কিন্তু এখন হিজবুত তাহরীর ছাড়াও আরো অনেক মুসলিম দল আছে। তারা ছাড়াও আরো অনেকে দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য চেষ্টা করছেন। বরং সত্য কথা হলো, পৃথিবীর অনেক এলাকা এখন মুজাহিদীনরা ইসলামী শরীয়াত অনুযায়ী পরিচালনা করেছেন। যেমনঃ মালির অংশ বিশেষ, ইয়েমেনের কিছু কিছু এলাকা, আফগানিস্তানের অধিকাংশ এলাকা, সোমালিয়ার অধিকাংশ এলাকা ইত্যাদি। এইসব মুজাহিদীনরা জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করে চলেছেন। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে এই রকম পরিস্থিত থাকলে নিশ্চয়ই তিনি কাফিরদের কাছে নুসরাহ না খুঁজে ইতিমধ্যে মুসলিমদের করায়ত্বে আসা এলাকায় চলে যেতেন।

– রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সময় পরিস্থিতি এমন ছিলো না যে, একবার একটা ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্টিত হবার পর তা আবার কাফির কর্তৃক দখল অথবা মুরতাদ শাসক কর্তৃক শরীয়াহ বিহীনভাবে শাসিত হচ্ছিলো। কিন্তু আমাদের সময়ে তা হয়েছে। আর এই কারণে আলেমদের ইজমা মতে আমাদের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে আছে, যা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সময় ছিলো না।

এসব পার্থক্যের কারণে এই কথা বলা যায় না যে, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য মক্কী যুগে যা করণীয় ছিলো, প্রথম খেলাফত প্রতিষ্টিত হবার আগে, আমাদের জন্যও একই হুকুম প্রযোজ্য। বরং আমাদের সময় এখন শরীয়াহ পরিপূর্ণ এবং পরিস্থিতিও অনেক আলাদা। এ কারণে কি করণীয় এই ফাতওয়াতেও পার্থক্য হবে। আর আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের সময়ে যা করণীয় তা হলোঃ

ক। যে সব মুসলিম এলাকা বিদেশী কাফিরদের দ্বারা আক্রান্তঃ সে সব এলাকায় দখলদার কাফিরদের বিরুদ্ধে সর্বাত্বক

জিহাদ ও ক্বিতাল করা। আর এই ব্যাপারে আলেমদের ইজমা রয়েছে।

ইবনে তাইমিয়া (রঃ) বলেনঃ

وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب؛ إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم، ونصوص أحمد صريحة بهذا

এতে কোন সন্দেহ নেই যে শত্রু কোন কোন মুসলিম দেশে প্রবেশ করে, তাহলে ঐ দেশের বাসিন্দাদের, ক্রমান্বয়ে তাদের নিকটবর্তী দেশের বাসিন্দাদের উপর তাদেরকে বহিস্কার করা ফরজে আইন হয়ে যায়, কারণ মুসলিমদের দেশ সমূহ হলো একটি দেশের মতো। তাই এক্ষেত্রে পিতা-মাতা অথবা ঋণদাতার নিকট থেকে অনুমতি ছাড়াই (জিহাদে) বের হয়ে যাওয়া ফরজ। (ফাতাওয়া আল কুবরা, ৪/৬০৮)

একই রকম বক্তব্য রয়েছে প্রায় সকল মুজতাহিদিন ফুকাহার এবং ফতোয়া ও ফিকহের কিতাবগুলোতে তা মজুদ আছে।

বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুনঃ মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা, আব্দুল্লাহ আজ্জাম (রঃ), পৃষ্টাঃ ২০-২২।

ডাউনলোড লিংকঃ https://bit.ly/2BqfUxk

খ। যে সব এলাকা দখলদার বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত নয় কিন্তু মুরতাদ শাসক কর্তৃক শাসিত হচ্ছেঃ সুস্পষ্ট কুফর (কুফরুন বাওয়াহ) প্রকাশ করার কারণে আলেমদের ইজমা মতে তাদেরকে অপসারণ করা, তাদের সাথে জিহাদ করা ফরজে আইন, যা আমরা 'আমাদের দাওয়াহ' পাতায় উল্লেখ করেছি।

আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির ব্যাপারে এটাই পূর্ববর্তী সম্মানিত আলিমদের মতামত।

আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

উত্তর প্রদানেঃ
শাইখুল হাদিস আবু ইমরান।
মুফতী আইনান।
মাওলানা আবু আনিকা।

৪। ডঃ আসাদুল্লাহ আল গালিব সাহেব, যিনি আহলে হাদিস আন্দোলনের আমির। তিনি তার বই এ উল্লেখ করেছেন ‘এই যুগের কলমের জিহাদই মূল জিহাদ’, এ ব্যাপারে উনার দৃষ্টিভঙ্গি কি ইসলাম সম্মত?

উত্তরঃ

ইন্নাল হামদা লিল্লাহ। ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসুলিল্লাহ।

প্রথমতঃ ডঃ আসাদুল্লাহ গালিব সাহেবকে আল্লাহ জাযায়ে খায়ের দান করুন এ কারণে যে, তিনি অন্যান্য অনেকের মতো দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য কুফর মিশ্রিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গিয়ে সামিল হয়ে যাননি।

বিশেষতঃ অন্য অনেকের মতো ‘জিহাদ’ শব্দটা মুখে আনতে তিনি ভীত হননি। বরং তিনি দ্বীন কায়েমের জন্য জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেছেন। তবে জিহাদের ব্যাপারে তার কিছু কথা অস্পষ্ট হওয়ায় আমরা সেই কথাগুলোর ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য তুলে ধরছি ইনশাআল্লাহ।

‘সমাজ বিপ্লবের ধারা’ বই এ ‘জিহাদের হাতিয়ার’ অধ্যায়ে ডঃ আসাদুল্লাহ গালিব সাহেব উল্লেখ করেছেনঃ

‘ইসলামের পরিভাষায় জিহাদের তাৎপর্য চিরকাল একই থাকবে। তবে জিহাদের পদ্ধতি পরিবর্তনশীল। অসিযুদ্ধ এখনই নয়। মসীযুদ্ধ অসির চাইতে মারাত্বক’।

একটু সামনে অগ্রসর হয়ে তিনি বলেছেনঃ

‘এ যুগে জিহাদের সর্বাপেক্ষা বড় হাতিয়ার হলোঃ কথা, কলম, সংগঠন। আপনাকে অবশ্যই কথা বলা শিখতে হবে। …’

‘আন্দোলন অথবা ধ্বংশ’ অধ্যায়ে তিনি বলেছেনঃ

‘কথা, কলম, সংগঠন – জিহাদের এই ত্রিমূখী হাতিয়ার নিয়ে আমাদেরকে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।’

‘ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি’ বই এ ‘জিহাদের প্রস্তুতি’ অধ্যায়ে ২৮ পৃষ্টাতে তিনি বলেছেনঃ

‘তাওহীদ বিরোধী আক্বীদা ও আমলের সংস্কার সাধনই হলো সবচেয়ে বড় জিহাদ। নবীগণ সেই লক্ষ্যেই তাঁদের সমস্ত জীবনের সার্বিক প্রচেষ্টা নিয়োজিত রেখেছিলেন।’

একই অধ্যায়ের ৩০ পৃষ্টায় তিনি বলেছেনঃ

‘অতএব শিরক ও বিদয়াতের বিরুদ্ধে আপোষহীনভাবে রুখে দাঁড়ানোই হলো প্রকৃত জিহাদ। … তাই একই সাথে তাওহীদের ‘দাওয়াত’ ও তাওহীদ বিরোধী জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে সর্বমূখী ‘জিহাদ’-ই হলো দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি।’

দ্বিতীয়তঃ ‘ইকামাতে দ্বীন’ কাকে বলে, এর অর্থ কি এসব বিষয়ের আলোচনায় তিনি সলফে সালেহীনদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন, বিভিন্ন তাফসীরকারকদের বক্তব্য তুলে এনেছেন। কিন্তু ‘জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ’ এর ব্যাপারে কথা বলার সময়

তিনি শুধুমাত্র নিজের বক্তব্য ও মতামত লিখেছেন। কিন্তু সলফে সালেহীনগণের, তাফসীর, হাদিস ও ফিকহের সম্মানিত ইমামগণের কোন বক্তব্য তিনি তুলে ধরেন নি। অথচ জিহাদ ফি সাবিলিল্লার ব্যাখ্যা স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহীহ হাদিসের মাধ্যমে পাওয়া যায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলোঃ

قيل وما الجهاد قال أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم قيل فأى الجهاد أفضل قال من عقر جواده وأهريق دمه – خرجه أحمد (4/114 ، رقم 17068) . وأخرجه أيضًا : عبد بن حميد (ص 124 رقم 301) قال المنذرى (2/106) : رواه أحمد بإسناد صحيح ، ورواته محتج بهم فى الصحيح ، والطبرانى وغيره ، ورواه البيهقى عن أبى قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه . وقال الهيثمى (1/59) : رواه أحمد ، والطبرانى فى الكبير بنحوه ، ورجاله ثقات .

অর্থাৎ, বলা হলোঃ জিহাদ কি? তিনি বললেন, কাফিরদের সাথে লড়াই করা যখন তাদের সাথে সাক্ষাত হয়। বলা হলোঃ কোন জিহাদ সর্বোত্তম? তিনি বললেনঃ যার ঘোড়া নিহত হয় ও রক্ত প্রবাহিত হয়। (মুসনাদে আহমাদ, তাবরানী, বাইহাকী, সনদ সহীহ)

এছাড়া এ ব্যাপারে সলফে সালেহীনদের বক্তব্যও সুস্পষ্ট। তিনি যদি এ ব্যাপারেও সলফে-সালেহীনদের বক্তব্য তুলে ধরতেন, তাহলে হয়তো পাঠকরা তার এসব বই পড়ে জিহাদের ব্যাপারে ভুল ধারনায় পড়তেন না।

তৃতীয়তঃ 'জিহাদ' শব্দের শাব্দিক অর্থ 'সর্বাত্বক চেষ্টা-সাধনা' হলেও ইসলামী শরীয়াতের দৃষ্টিতে জিহাদ অর্থ হলোঃ

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস বুখারী শরীফের আরবী ভাষ্যকার ইমাম কাসতালানী (রঃ) বলেন,

قتال الكفارلنصرة الإسلام ولإعلاء كلمة الله

"জিহাদ হলোঃ দ্বীন ইসলামকে সাহায্য করার জন্য ও আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করার জন্য কাফিরদের সাথে কিতাল করা।"

ইমাম ইবনে হুমাম (রঃ) বলেন,

الجهاد : دعوة الكفار إلى الدين الحق وقتالهم إن لم يقبلوا

"জিহাদ হচ্ছে কাফিরদেরকে সত্য দ্বীন ইসলামের প্রতি আহবান করা এবং যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে তাদের সাথে লড়াই করা।" (ফাতহুল ক্বাদীর ৫/১৮৭)

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রঃ) বলেনঃ

وفى الشرع بذل الجهد فى قتال الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى

"শরীয়াতের পরিভাষায় জিহাদ হলোঃ আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে সর্বশক্তি ব্যয় করা"। (উমদাতুল ক্বারী, ১৪/১১৫)

ইমাম কাসানী (রঃ) বলেন,

بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله عزوجل بالنفس والمال واللسان وغير ذلك

“শরীয়াতের পরিভাষায় (জিহাদ হলো) নিজের জীবন, সম্পদ, মুখ ও অন্যান্য যা কিছু দিয়ে সম্ভব তার মাধ্যমে আল্লাহর পথে লড়াই করার জন্য শক্তি ও ক্ষমতা উৎসর্গ করা”। (আল বাদায়ীউস সানায়ী ৯/৪২৯৯)

মালেকী মাজহাবে জিহাদের সংজ্ঞা হলোঃ

قتال المسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله، أو حضوره له، أو دخوله أرضه له

“মুসলিমের জন্য আল্লাহর আইনকে সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে যেসব কাফির কোন চুক্তির অধীনে নয় তাদের বিরুদ্ধে অথবা যদি তারা আক্রমণ করার জন্য মুসলিমের সামনে উপস্থিত হয় অথবা যদি মুসলিমের ভূমিতে অনুপ্রবেশ করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা।” (হাশিয়া আল – আদাউয়ি, আস-সায়িদী ২/২ এবং আশ-শারহুস সগীর আকরাব আল-মাসালিক লিদ-দারদীর; ২/২৬৭)

শাফেয়ী মাজহাবের ইমাম বাজাওয়ারী (রঃ) এর মতেঃ

الجهاد أي القتال في سبيلالله

“আল জিহাদ অর্থ আল্লাহর পথে লড়াই করা”। (হাশিয়াত বাজাওয়ারী আলা শারহুন ইবনুল কাসিম, ২/২৬১)

ইবনে হাজার (রঃ) এর মতেঃ

وشرعا بذل الجهد في قتال الكفار

“শরয়ী দৃষ্টিতে এর অর্থ হলো কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই এ ত্যাগ স্বীকারমূলক সংগ্রাম”। (ফাতহুল বারী ৬/৩)

হাম্বলী মাজহাবের সংজ্ঞা হচ্ছেঃ

قتال الكفار

“(জিহাদ হচ্ছে) কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করা”। (মাতালিবু উলিন নাহি ২/৪৭৯)

الجهاد: القتال وبذل الوسع منه لإعلاء كلمة الله تعالى

“আল জিহাদ হচ্ছে আল ক্বিতাল এবং এই লড়াইয়ে উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর আইনকে সম্মুন্নত রাখা”। (উমদাতুল ফিকহ ১৬৬ পৃষ্টা ও মুনতাহাল ইরাদাত ১/৩০২)

ইমাম বুখারী (রঃ) ‘কিতাবুল জিহাদে’ শুধু কিতাল সংশ্লিষ্ট হাদিসগুলোই উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য মুহাদ্দিসগণও ‘জিহাদ অধ্যায়ে’ ঘোড়া, তরবারী, বর্ম, গণিমত, বন্দী, আক্রমণ ইত্যাদি কিতাল সংশ্লিষ্ট হাদিসগুলোই উল্লেখ করেছেন। এমনিভাবে ফুকাহায়ে কিরামও ফিকহের কিতাব সমূহে জিহাদের আলোচনায় কিতাল সম্পর্কিত মাসায়েল উল্লেখ করেছেন।

এ আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, ডঃ আসাদুল্লাহ আল গালিব সাহেব উল্লেখিত বইগুলোতে জিহাদ শব্দকে ইসলামী পরিভাষাগত (শরয়ী) অর্থে ব্যবহার করেন নি। বরং তিনি এ ক্ষেত্রে শাব্দিক অর্থে, কোথাও কোথাও নিজের আবিস্কৃত নতুন অর্থে ব্যবহার করেছেন!!

চতুর্থতঃ ‘এ যুগে জিহাদের সর্বাপেক্ষা বড় হাতিয়ার হলোঃ কথা, কলম, সংগঠন। আপনাকে অবশ্যই কথা বলা শিখতে হবে। …’ এই কথা উনি কোথায় পেলেন? এ রকম কথা কোরআন, সুন্নাহ, সলফে সালেহীনদের উপলব্ধি কোথাও পাওয়া যায় না। এটা উনার ব্যক্তিগত এমন একটি কথা যার পক্ষে কোন দলীল নেই। তাই এই কথা গ্রহণযোগ্য নয়। এটা বাতিল।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

بعثت بين يدي الساعة بالسيف

আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য তরবারি (অসি) দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

একদিকে গালিব সাহেব দাবী করছেন, এখন আর অসির সময় নয়। অথচ দেখা যাচ্ছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরবারির নিচে এ যুগের তথাকথিত মুজতাহিদগণের মস্তিষ্ক প্রসূত অভিমত বধ হয়ে যাচ্ছে। অথচ রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরবারি দ্বারা দ্বীন বিরোধীদের মগজের খোপড়ী বিচ্ছিন্ন হচ্ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেনঃ

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله

“যতক্ষণ না মানুষ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহের সাক্ষ্য না দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে মানুষের সাথে কিতাল করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।”

আর এটা তো জানা কথা যে, সবাই ‘লা ইলাহা ইল্লালাহ’ গ্রহন করবে একেবারে কিয়ামতের পূর্বে, ঈসা (আঃ) এর আগমনের পর। অর্থাৎ সে সময় পর্যন্ত কিতাল চলবে। আর কিতাল যে অসি তথা অস্ত্র দিয়েই হয়, কলম দিয়ে হয় না, এটা এই দুনিয়ায় শিশুরাও বুঝবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেনঃ

الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ – أحمد ، ومسلم ، والنسائى ، وابن حبان والبخارى ، والترمذى

অর্থাৎ, ঘোড়ার কপালে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ রয়েছে তা হলো সওয়াব ও গনিমত।

কিন্তু ঘোড়া দ্বারা এই দুনিয়ার কোন যুদ্ধের ময়দানে লিখা হয়? ঘোড়া দ্বারা করা যায় কিতাল। তাহলে অসিযুদ্ধ এখনি নয় – কথাটির মাহাত্ম কি?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেনঃ

لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم

অর্থাৎ, আমার উম্মতের মাঝে সর্বদা হক্কের উপর যুদ্ধরত একটি দল অব্যাহত থাকবে, তাদের বিরোধিতাকারীদের উপর তারা বিজয়ী থাকবে।

বহু সংখ্যক হাদিসে এই তায়েফাতুল মনসুরাহ বা বিজয়ী দলের একটি বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে ক্বিতাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাহলে যদি এখন অসির যুগ না থাকে, তা হলে এই সত্যপন্থী দলটি কিভাবে ক্বিতাল করবে? ক্বিতাল তো কলম তথা মসি, যুক্তি-তর্ক কিংবা বক্তৃতা ইত্যাদি দিয়ে করা যায় না।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেনঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। (সূরা আহযাব, আয়াতঃ ২১)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামত পর্যন্ত أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ কিন্তু যাদের ভাষ্যমতে বর্তমান যুগ মসির যুগ, তারা ভেবে দেখুন মসির যুগের যোদ্ধাদের জন্য এমন একজনকে আল্লাহ রব্বুল আলামীন অনুসরণীয় নির্ধারণ করলেন যার জীবন কেটেছে অসির মাধ্যমে যুদ্ধের উপর। মসির যুদ্ধের মডেল হলেন অসির যোদ্ধা?

কি উদ্ভট গবেষণা!

কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বেশী প্রভাব সৃষ্টিকারী কে হতে পারেন? তিনি ছিলেন জাওয়ামিউল কালিম এবং أفصحالعرب এতদসত্ত্বেও রাসূলকে অসি ধরতে হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে বড় নেতা, উন্নত সংগঠক আর কে হতে পারবে? তারপরেও তাকে তরবারী হাতে নিতে হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় তেরো বছর অসিবিহীন চেষ্টা ও দাওয়াতী তৎপরতা চালিয়েছেন এত কিছু সত্ত্বেও ইকরামা ইবনে আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান, হিন্দা ও মক্কার অন্যান্য সাধারণ অধিবাসীরা, যারা পরবর্তীতে আমাদের সময়ের যে কোন সংগঠক কিংবা দায়ীর হাতে ইসলাম গ্রহণকারীর চেয়ে বহুগুনে শ্রেষ্ঠ মুসলমান হয়েছিলেন, তারাও তখন ইসলাম গ্রহন করেননি।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا

যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন। (সূরা নছর, আয়াতঃ ১-২)

অর্থাৎ, বিজয় আসলে ইসলাম বিস্তৃত হবে, দলে দলে মানুষ ইসলামে আসবে। আর বিজয় আসবে আল্লাহর সাহায্যে। আল্লাহর সাহায্য আসবে বান্দা যখন আল্লাহকে সাহায্য করবে। আল্লাহ বলেছেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবেন। (সূরা মুহাম্মদ, আয়াতঃ ৭)

আর আল্লাহ তায়ালাকে সাহায্য করা হয় লোহা দিয়ে। আল্লাহ বলেছেনঃ

وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ

আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচন্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ জেনে

নিবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রসূলগণকে সাহায্য করে। (সূরা হাদীদ, আয়াতঃ ২৫)
।
জিহাদের পদ্ধতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে আমল করে দেখিয়েছেন। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) তদানুসারে পথ চলেছেন। উম্মত জিহাদের একটি রূপ উপলব্ধি করে আসছে। যেমন 'ছালাত' যখন বলা হয় তখন একটি রূপ মানসপটে ভেসে ওঠে, এর মধ্যে কারো কোন সংশয় থাকে না। অর্থাৎ কিয়াম, কিরাত, রুকু, সিজদাহ, তাহারাত এর মাধ্যমে যা আদায় করা হয় সেই ছালাতকেই সবাই বুঝেন। কেউ সালাত আদায় করেছে বলতে দুয়া করা বুঝায় না। অথচ দুয়া অর্থেও সালাত শব্দটির ব্যবহার হয়েছে।

'হাইয়া আ'লাস ছালাহ' শুনলে কেউ এটা বুঝেনা যে, মসজিদে গিয়ে দুরুদ শরীফ পড়ে আসলেই হবে। অথচ দুরুদ শরিফকেও কোরআনে ছালাত বলা হয়েছে (শাব্দিক অর্থে)। জিহাদের হলো তাই যা তীর, ধনুক, তরবারী, ঘোড়া, বর্ম এগুলোর মাধ্যমে সংগঠিত হয়। সময়ের ব্যবধানে এগুলোর ধরন পরিবর্তন হতে পারে – যেমন বন্দুক, গুলি, বোমা, ড্রোন, ইত্যাদি তবে যুদ্ধ সর্বদা যুদ্ধই থাকবে – যুদ্ধ কখনো লিখনি কিংবা ভাষন হয়ে যাবে না। সে যুগেও লিখনি ছিল কিন্তু এটাকে কেউ যুদ্ধ বলেননি।

হ্যাঁ কিতালের প্রতি উৎসাহ প্রদান, বিরোধীদের দলিল খণ্ডন, কৌশল প্রণয়ন এগুলো যা কিতাল তথা যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট – এগুলোকেও ফুকাহায়ে কেরাম জিহাদ এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর মূলতঃ মুখ, কলম ইত্যাদির দ্বারা যে জিহাদ আছে, তা এটাই।

কিতাল তথা যুদ্ধ হল সশস্ত্র লড়াই, জিহাদ তার চেয়ে একটু ব্যাপক। অর্থাৎ জিহাদ হলো যুদ্ধ সংক্রান্ত যে কোন কর্মকাণ্ড, প্রস্তুতি, উৎসাহ প্রদান, হত্যা-চিন্তা, যুদ্ধের পরিকল্পণা প্রণয়ন ইত্যাদি। দ্বীন বিজয়ের নিয়্যতে যে কোন চেষ্টা – এটা পরিভাষায় জিহাদ নয়, শাব্দিক জিহাদ হতে পারে। আর শাব্দিক জিহাদ কখনো জিহাদের আহকাম, ফযিলত, প্রভাব, তাসির কিংবা ফল বহন করে না। যেমনঃ স্ত্রী সহবাস কে শাব্দিক অর্থে জিহাদ বলা হয়।

إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل

অর্থাৎ, যখন তোমাদের কেউ (স্ত্রীর) চার শাখা (হাত-পা) এর মাঝে বসে তারপর 'জিহাদ' করে, তার জন্য গোসল ওয়াজিব।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

(পিতা-মাতা) যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়ে শরীক স্থির করতে 'জিহাদ' করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের কথা মানবে না। (সূরা লোকমান, আয়াতঃ ১৫)

এখানে বলা হচ্ছে কাফের মাতাপিতা যদি তোমাদের শিরক করার জন্য চূড়ান্ত চাপ প্রয়োগ করে তাদের কথা শোন না। এখানে কাফেরের পক্ষ থেকে চাপ প্রয়োগকে জিহাদ শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করা হয়েছে।

এখন কি বলা হবে যে এ কাফের মাতা পিতা দ্বারা জিহাদ হয়েছে? তারা মুজাহিদ? জিহাদের ফযিলত তারা পাবে? এর দ্বারা দ্বীন বিজয়ী হবে?

ইহুদিদের স্বভাব পারিভাষিক অর্থ ও শাব্দিক অর্থের ব্যবধান না মানা । যেমনঃ ابناء শব্দটি পারিভাষিক ভাবে 'প্রিয়' এর অর্থ বহন করে, ইহুদি-খ্রিস্টানরা এটাকে শাব্দিক অর্থ গ্রহন করে, তারা বলে যে আমরা আল্লাহ্‌র সন্তান। নাউজুবিল্লাহ! কি

জঘন্য কাজ।

তারা পরিভাষাকে গুলিয়ে ফেলার কারনে تحريف করার কারণে শিরক পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। যারা বসে বসে কলমের খোঁচায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রক্ত ঝরা দান্দান শহীদ হওয়া জিহাদকে গুরুত্বহীন করে দিচ্ছেন, তাদের রাসুলের বিরোধিতার কারণে কোন ফিতনায় পড়ে যাওয়া অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাবে আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে ভয় করা উচিত। হামযা (রাঃ) টুকরো টুকরো হয়েছেন যে জিহাদে, সাহাবায়ে কেরামের শতকরা আশি ভাগ যে জিহাদে শহীদ হয়েছেন, কোরআনের সাড়ে চারশত এর অধিক আয়াতের মধ্যে যে জিহাদের আলোচনা করা হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাতাশটির উপরে জিহাদি অভিযানে সৈন্য পরিচালনা করেছেন, অর্ধ শতকের উপরে জিহাদে সাহাবায়ে কেরামকে পাঠালেন – সে জিহাদ কারো কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে!! আবার কারো নিকট এটা জঙ্গিবাদ!! নাউজুবিল্লাহ!

সার কথাঃ জিহাদ অর্থ কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ, জিহাদকে অস্বীকারকারী কাফির, অপব্যখ্যাকারী গুমরাহ, পরিত্যাগকারী ফাসেক। (ছরখছী)।

কিতালের মাধ্যমেই দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে, ফিতনাহ তথা শিরক, শিরকের প্রভাব প্রতিপত্তি খতম হবে।

হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ কলম-সৈনিক তৈরী হয়ে গেলেও দ্বীন বিজয়ী হবে না, যতক্ষণ না দ্বীন বিজয়ী করার জন্য আল্লাহ যে পথ দেখিয়েছেন সে পথ গ্রহন করা হবে। সে পথ কি? আল্লাহ পাকের স্পষ্ট ঘোষণাঃ

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায়; এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন। (সূরা আনফালঃ ৩৯)

ফিতনাহ শেষ হওয়া আর পরিপূর্ণ দ্বীন প্রতিষ্ঠা হওয়া নির্ভর করে কিতালের উপর। কিতাল কঠিন, অপছন্দনীয়, কষ্টকর। বিজ্ঞ হাকিম কি আমাদেরকে এমন কষ্টের ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন আরও সহজে অসুখ নিরাময় হবার পথ বাদ দিয়ে? অথচ তিনি আরহামুর রাহিমীন। তাহলে এবার চিন্তা করুনঃ ফিতনা দূরীভূত হবার, দ্বীন প্রতিষ্ঠা হওয়ার আর কোন সহজ পদ্ধতি থাকতে পারে কি?

আমাদের ইয়াকিন হলো – না, আর নেই। থাকলে সেটা দয়াময় আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিতেন।

কাফেরদের সম্পর্কে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেছেন,

وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ

বস্তুতঃ তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদিগকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব হয়। (সূরা বাকারাঃ ২১৭)

কাফেররা দ্বীন থেকে ফিরানোর জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহন করবে? – কিতাল।

এখন দ্বীন রক্ষায় কি করণীয়? কিতাল এর মুকাবেলায় কি রুমাল কিংবা কলম নিয়ে মুখোমুখি হওয়া? নাকি শত্রু যেভাবে আসবে তেমন ধরনের হাতিয়ার নিয়ে যাওয়া? হ্যাঁ, শত্রু কলমের আগ্রাসন, সাংস্কৃতিক আক্রমণ, অর্থনৈতিক হামলা সব প্রয়োগ করছে কিন্তু এগুলো সবই সামরিক শক্তির অধীন। সামরিক বিজয় যার থাকবে এসব শক্তি তার পক্ষেই কাজ

করবে। আজ কুফফারদের সামরিক বিজয় বিদ্যমান বিধায় এসব ক্ষেত্রে সমগ্র পৃথিবী তাদের অনুসারী।

মানুষ তার রাজন্যবর্গের মতাদর্শ গ্রহণ করে থাকে। সুরায়ে নাসর এর বক্তব্যও এর সমর্থন করে। নতুবা পশ্চিমাদের সংস্কৃতি, সমাজব্যবস্থা কি ইসলামের চেয়ে উন্নত যে কারণে মুসলমানরা পর্যন্ত তাদের আদর্শগুলো গ্রহণ করছে? এটা তাদের সামরিক বিজয়ের প্রভাব। নতুবা লেখনীর / বক্তব্যের ক্ষেত্রে মুসলমানদের নিকট রয়েছে কিতাবুল্লাহ এর মতো মুজিযা। এর চেয়ে বড় লেখা / বক্তব্য পৃথিবীর সমুদয় লেখক-বক্তা কিয়ামত পর্যন্ত লিখে, বক্তৃতা দিয়ে এর ধারে কাছেও কি পৌঁছাতে পারবে? বাস্তবে লিখার ক্ষেত্রে আমাদের বিজয় বিদ্যমান।

এতদসত্বেও কোরআনের আদর্শ, বিধিবিধান, হুকুম-আহকাম কেন স্বয়ং মুসলিমরাই গ্রহণ করছে না? আপনি কোরআনের চেয়ে বেশি লিখে ফেলবেন? আরও উন্নত বক্তব্য দিয়ে ফেলবেন? পারবেন না। কিন্তু কোরআন মানা হচ্ছেনা কেন? সমাজে নামাজ নেই কেন, জাকাত নেই কেন, বরং সমাজে সুদ বিস্তৃত হচ্ছে কেন?

নামাজ ফরজ এটা মানুষ জানে না এ কারণে, নাকি এর দাওয়াত পৌঁছে নাই একারণে? নাকি রাফে ইয়াদাইনের ঝগড়ার নিস্পত্তি না হওয়ার কারনে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেনঃ

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ

তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। (সূরা হজ্ব, আয়াতঃ ৪১)

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ইকামতে ছালাত হবে ক্ষমতা লাভ হলে। আল্লাহ বলছেন, মুমিনরা যদি ক্ষমতা পায় তখন ছালাতের প্রচলন করে আর আমাদের কেউ কেউ বলছে ‘এর জন্য ক্ষমতার প্রয়োজন নাই’। নাউজুবিল্লাহ!

ক্ষমতা আসলে কিভাবে কিতাব প্রতিষ্ঠিত হবে?

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

আমি আমার রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচন্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ জেনে নিবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী। (সূরা হাদীদ, আয়াতঃ ২৫)

দ্বীনের সাহায্য করার উপায় হলোঃ

লোহা-অসি-অস্ত্র দিয়ে। মসিহ আলাইহিস সালাম দাজ্জালকে দমন করবেন অসি হাতে নিয়েই।

আল্লাহ পাক নিজে কিতাল করেছেন। নবী অলিদের, ফিরিশতাদের দিয়ে কিতাল করিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ মিশনেই ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কে এ পথেই রেখে গেছেন।

সাহাবায়ে কিরাম এ পথেই অর্থাৎ অস্ত্র-সরঞ্জাম সহ পৃথিবীর দিকে দিকে এগিয়ে গেছেন। বিজয় এনেছেন। উম্মতের একটি

জামাতের কিতালের মাধ্যমে এ বসুন্ধরা ইসলামের আলোয় আলোকিত হয়েছে। কুফর অপসারিত হয়েছে। ধীরে ধীরে আমরা সে পথ ছেড়ে আরামের পথ ধরে, এখন নানাবিধ ব্যারামে ভুগছি। যতক্ষণ সে পথ ফের না ধরবো, সেই ব্যারাম সারবে না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

إذا تبايعتم بالعينة، ورضيتم بالزرع، وتبعتم أذناب البقر، سلط الله عليكم ذُلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم

যখন তোমরা ঈনা (সন্দেহযুক্ত) কেনাকাটা শুরু করবে, গরুর লেজ ধরবে, ফসল ফলানো নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে, আর জিহাদ ছেড়ে দিবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর অপমান চাপিয়ে দেবেন তা সরাবেন না যতক্ষণ তোমরা দ্বীনের দিকে ফিরে না আসবে। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস সহীহ)

এখানে দ্বীনের দিকে ফেরত আসা বলতে হাদিসের ইমামগণ জিহাদ বুঝেছেন।

সুতরাং, অসিযুদ্ধ এখনই নয়, এখন মসি যুদ্ধের সময় – এসব কথা নফসের খায়েশাত ছাড়া আর কিছু নয়। এসব কথার পক্ষে কোন দলীল-প্রমাণ নেই।

অনুরুপভাবে, 'তাওহীদ বিরোধী আক্বীদা ও আমলের সংস্কার সাধনই হলো সবচেয়ে বড় জিহাদ' – আক্বীদা ও আমলের সংশোধনকে জিহাদ বলা হয়েছে, এমন কোন দলীল আমরা ইসলামে পাই না। হাদিস কিংবা ফিকহের কোন ইমামও এ রকম কোন কথা বলেন নি। যদি আক্বীদার সংশোধন জিহাদ হয়, তবে দাওয়াহ ইলাল্লাহ কি? তবে তালিম-তারবিয়া কি? আমরে বিল মারুফ-নাহি আনিল মুনকার কি?

তাই আমাদেরকে সর্বদা যথাযথ শব্দ ব্যবহার করতে হবে।

অনুরুপভাবে, 'তবে জিহাদের পদ্ধতি পরিবর্তনশীল। অসিযুদ্ধ এখনই নয়। মসীযুদ্ধ অসির চাইতে মারাত্বক' – এই কথার পক্ষেও কোন দলীল-প্রমাণ নেই। এটা ইসলামের কোন কথা নয়। বরং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي

নিশ্চয়ই নিক্ষেপের মধ্যে আছে শক্তি, নিশ্চয়ই নিক্ষেপের মধ্যে আছে শক্তি, নিশ্চয়ই নিক্ষেপের মধ্যে আছে শক্তি। (সহীহ মুসলিম, সুনান আবু দাউদ, সুনান ইবনে মাজাহ, সুনান তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ)

দেখা যাচ্ছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিক্ষেপের তথা তীর, অসি, বন্দুক ইত্যাদির মধ্যে আছে শক্তি। কিন্তু এরকম সুস্পষ্ট হাদিস থাকার পরও কিভাবে আমরা 'মসীযুদ্ধ অসির চাইতে মারাত্বক' – এই ধরনের কথা বলতে পারি। বরং আল্লাহ আমাদেরকে জিহাদের প্রস্তুতির জন্য ঘোড়া ও শক্তি সঞ্চয় করতে বলেছেন।

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ

"আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সামর্থ অনুযায়ী সংগ্রহ করো শক্তি-সামর্থ্য ও পালিত ঘোড়া …" (সূরা আল আনফাল, আয়াতঃ ৬০)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জিহাদের জন্য মুসলমানদেরকে বড় বড় লেখক, সাংবাদিক হতে বলেন নি। কলমের ব্যবহারকে বেশী শক্তিশালী বলেন নি। বরং শক্তি ও ঘোড়া জোগাড় করতে বলেছেন। সুতরাং ডঃ আসাদুল্লাহ গালিব সাহেবের জিহাদ

সম্পর্কে এই ধারনাগুলো আল-কোরআন ও হাদিসের পরিপন্থী।

আমরা কলমের গুরুত্বকে অস্বীকার করছি না, মিডিয়ার গুরুত্বকে অস্বীকার করছি না, মানুষের মন-মানষিকতা পরিবর্তনে লেখনীর গুরুত্বকে অস্বীকার করছি না। কিন্তু শরীয়াতে প্রত্যেক বিষয়ের একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে। সেটাকে তার চাইতে বেশী আগে বাড়িয়ে দিলে, সমস্যা দেখা দেয়। বরং প্রত্যেকটা বিষয়কে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যতটুকু গুরুত্ব দিয়েছেন, ততটুকু দেয়াই উচিত।

বরং আল্লাহ বলছেন, কাফিররা চায়, আমরা যেন আমাদের অস্ত্র সম্পর্কে বেখবর হয়ে যাই, আর শুধু মসী-কলম ইত্যাদি নিয়ে পড়ে থাকি, যাতে তারা আমাদের উপর সহজে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। আর দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলিম উম্মাহ এখন এই অবস্থার সম্মুখীন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেনঃ

وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً

কাফেররা চায় তোমরা তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র এবং সরঞ্জামাদি থেকে গাফিল হও যাতে তারা তোমাদেরকে একযোগে আক্রমন করতে পারে। (সূরা আন নিসা, আয়াতঃ ১০২)

পঞ্চমতঃ এই সাইটে এক মন্তব্যকারী মন্তব্য করেছেন, "এটি আসাদুল্লাহ আল গালিব এর একটি ইজতিহাদ"। এই ব্যাপারে আমাদের কথা হলোঃ ইজতিহাদ হয় আল-কোরআন ও হাদিসের আলোকে একটি নতুন সমস্যার সমাধান দেবার সময়। কিন্তু 'আল-জিহাদের অর্থ কিংবা সংজ্ঞা' তো আজ চৌদ্দশত বছর পর নতুনভাবে দেয়া হচ্ছে না, কিংবা এটা নতুন কোন বিষয়ও নয় যে এর উপর কেউ এখন ইজতিহাদ করবে। বরং যুগে যুগে আলিমরা এই ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে কথা বলে গেছেন। তাই জিহাদ কাকে বলে, এর অর্থ কি – এসব ব্যাপারে কোন ইজতিহাদের স্থান নেই। তাই মন্তব্যকারীর এই মন্তব্য গ্রহনযোগ্য নয়।

আর কলমের মাধ্যমে জিহাদের ব্যাপারটা ইমাম কাসানী (রঃ) এর সংজ্ঞায় এসে গেছে। তিনি বলেছেনঃ "শরীয়াতের পরিভাষায় (জিহাদ হলো) নিজের জীবন, সম্পদ, মুখ ও অন্যান্য যা কিছু দিয়ে সম্ভব তার মাধ্যমে আল্লাহর পথে লড়াই করার জন্য শক্তি ও ক্ষমতা উৎসর্গ করা"। তাই মুখ, কলম ইত্যাদি দিয়ে জিহাদে শরীক হওয়া যাবে তবে সেটা হতে হবে কিতাল ফি সাবিলিল্লাহর (সম্মুখ যুদ্ধের) সমর্থনে। কিন্তু ক্বিতালের সাথে সম্পর্কহীন কলমের মাধ্যমে দ্বীনের খেদমত দাওয়াহ, তারবীয়া-তাসফিয়া, আমরে বিল মারুফ-নাহি আনিল মুনকারের অংশ হতে পারে কিন্তু জিহাদের অংশ হবে না।

পরিশেষে আমরা বলতে চাইঃ ডঃ আসাদুলাহ গালিব সাহেবের উপরুক্ত কথাগুলো যথার্থ নয়, এসব কথার পক্ষে কোন দলীল-প্রমাণ নেই। বরং এই কথাগুলো সুস্পষ্ট আয়াত ও হাদিসের বিরোধী। এগুলো তার একান্ত নিজস্ব কিছু মত যার পক্ষে আল-কোরআন, হাদিস কিংবা সলফে সালেহীনদের কোন বক্তব্য নেই।

উল্লেখ্য, এই বইসমূহে আরো কিছু বিষয় ছিলো যা আমাদের দৃষ্টিতে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও অগ্রণযোগ্য মনে হয়েছে, কিন্তু আমরা শুধুমাত্র এই প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিত বিষয় নিয়েই আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে ইসলামী শরীয়াতের আলোকে জিহাদকে বুঝার ও জিহাদে সামিল হবার তৌফিক দান করুন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ

যে ব্যক্তি নিজে গাযওয়াতে (যুদ্ধের জন্য বের হওয়া) যায়নি কিংবা গাযওয়াতে যাবার ইচ্ছা পোষণ করেনি, সে নিফাকের একটি শাখার উপর মৃত্যু বরণ করলো। (সহীহ মুসলিম)

আল্লাম সিন্দী (রঃ) সুনান নাসায়ীর হাশিয়াতে বলেন, ‘এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, সে জিহাদের যাবার নিয়্যত করে নি। আর জিহাদে যাবার নিয়্যত থাকার প্রমাণ হলোঃ প্রস্তুতি গ্রহণ করা। আল্লাহ বলেছেনঃ

وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً

আর যদি তারা বের হবার সংকল্প নিত, তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো। (সূরা আত তাওবা, আয়াতঃ ৪৬)’

আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে নিফাকের শাখায় মৃত্যু হতে হিফাজত করেন।

৫। আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার পর মুসলমানদের উপর শরীয়তের বিধান - পাকিস্তানের সাবেক মুফতী শাইখ নিজামুদ্দীন শামজাই (রহঃ) এর ফতোয়া

আফগানিস্তানে মার্কিন হামলার পর মুসলমানদের উপর শরীয়তের বিধান নিম্নরূপঃ

প্রথমতঃ সকল মুসলমানের উপরই জিহাদ ফরজে আইন হয়ে আছে। বিশেষতঃ বর্তমান প্রেক্ষাপটে। কেননা ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান সেই একক ইসলামী রাস্ট্র যেখানে শরীয়তের বিধান বাস্তবায়িত। এর প্রতিরক্ষা প্রতিটি মুসলমানের উপর ওয়াজিব। ইহুদী- আমেরিকী এই আক্রমণের মূল লক্ষ্য আফগানিস্তানের ইসলামী শাসনকে ধ্বংস করে দেয়া।

দ্বিতীয়তঃ যে কোন দেশের যে কোন মুসলমান, হোক সে সরকারি চাকুরীজিবী অথবা অন্য কেউ – তার জন্য আফগানিস্তানে আমেরিকার আগ্রাসনে যে কোনরূপে, যে কোন ধরনের সহয়তা করা জায়েজ নেই। বিশেষতঃ মুসলিম আফগানিস্তানের উপর আগ্রাসন ক্রুসেড যুদ্ধের রুপ পরিগ্রহ করেছে। যে কোন মুসলমান এই আগ্রাসনে সহায়তায় এগিয়ে আসবে সে ধর্মত্যাগী মুরতাদ বলে গন্য হবে।

তৃতীয়তঃ যে কেউ আল্লাহ পাকের বিধানাবলী এবং তার শরীয়তের বিরোধীতা করে, তার অধিনস্থ কর্মচারী অথবা সেনাসদস্য বা অন্য সবার উপর সেই ব্যক্তির নির্দেশাবলীর বিরোধীতা করা ও তার আনুগত্য পরিহার করা ওয়াজিব।

চতুর্থতঃ যে সকল দেশ এই যুদ্ধে আমেরিকাকে সমর্থন দিচ্ছে এবং ভূমি, আকাশ অথবা তথ্য দ্বারা সহায়তা করছে এবং মুসলমানদেরকে তাদের কর্তব্য পালনে বাঁধা দিচ্ছে, এ ধরনের প্রশাসন ও শাসকদেরকে যে কোন উপায়ে অপসারন করা মুসলমানদের উপর ওয়াজিব।

পঞ্চমতঃ বর্তমান সময়ে আফগান মুজাহিদদেরকে আর্থিক, নৈতিক ও রশদ-সামগ্রী দ্বারা সাহায্য করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ, আর যার পক্ষে আফগানিস্তানে পৌঁছা এবং তাদের পাশে থেকে যুদ্ধ করা সম্ভব নিশ্চিতভাবে তার জন্য শরয়ী ওয়াজিব হলো সরাসরি তাতে অংশগ্রহণ করা। আর যে এতে অক্ষম তার কর্তব্য হলো সম্ভাব্য সব পদ্ধতিতে তাদেরকে সহায়তা করা।

করাচী, ৮ অক্টোবর ২০০১

পরিচয়ঃ

মুফতী নিজামউদ্দিন শামজাই (রঃ) সোয়াতে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর ১৯৬০ সালের দিকে দ্বীনি তালিম হাসিলের জন্য করাচির দারুল খায়ের মাদ্রাসায় ভর্তি হন। পরবর্তীতে তিনি দীর্ঘদিন ছাত্র এবং শিক্ষক হিসেবে জামিয়া ফারুকিয়া মাদ্রাসার সাথে যুক্ত ছিলেন। দীর্ঘ চৌদ্দ বছর তিনি জামিয়া ফারুকিয়া মাদ্রাসার ইফতা বিভাগের প্রধান ছিলেন।

১৯৮৮ সালে মুফতি এবং শিক্ষক হিসেবে তিনি করাচির বিনরি টাউনে জমিয়াতুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসায় যোগ দেন এবং শাহাদাত লাভের পূর্ব পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। মাওলানা হাবিবুল্লাহ মুখতার এর মৃত্যুর পর থেকে তিনি জমিয়াতুল উলুম ইসলামিয়ার ইফতা বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

১৯৯০ সালের শুরুর দিকে, জামশর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ইমাম বুখারীর শায়েখদের (শিক্ষকের) উপর পিএইচডি করেন। তারপর থেকে তিনি বিনরি টাউন মাদ্রাসায় বুখারী শরীফেরও দারস দিতেন।

তিনি আরবি, ফারসি, পুশতু ও উর্দু ভাষায় পন্ডিত ছিলেন। প্রতি জুমুয়াবার উর্দু 'দৈনিক জং' পত্রিকায় তিনি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতেন। এর আগে তাঁর উস্তাদ মাওলানা মোহাম্মাদ ইউসুফ লুদিয়ানবি (রঃ) করাচিতে শহীদ হবার আগ পর্যন্ত এই প্রশ্ন-উত্তর প্রদান করতেন।

মুফতি শামজাই (রঃ) ছিলেন ইসলামিক আমিরাত অব আফগানিস্তান এবং তালিবান মুজাহিদীনদের একজন বড় সমর্থক। আফগানিস্তানের ইসলামিক শাসনামলে তিনি কয়েকবার সেখানে সফর করেন এবং মোল্লা মোহাম্মদ ওমর (দাঃ বাঃ) এর সাথে সাক্ষাত করেন। মোল্লা ওমর (দাঃ বাঃ) তাঁকে অনেক সম্মান করতেন।

মুফতি শামজাই (রঃ) ঐ সকল আলেমদের অন্যতম যারা ১৯৭৯-৮০ সালে আফগানিস্তানে সোভিয়েত দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদের ফাতওয়া প্রদান করেন। ২০০১ সালের শেষের দিকে ইসলামিক আমিরাত অব আফগানিস্তানে ক্রুসেডার আমেরিকার হামলার পরও তিনি মুজাহিদীনদেরকে ক্রমাগতভাবে সমর্থন দিয়ে যান।

২০০৪ সালের মে মাসে ইসলামের শত্রুরা আততায়ী প্রেরণ করে তাঁকে শহীদ করে দেয়। তাঁর শাহাদাত লাভের পর করাচিতে শেরশাহ এলাকার জামিয়া উসমানিয়ার প্রধান ক্বারী মোহাম্মদ উসমান তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেনঃ

"তিনি ছিলেন পাকিস্তানে ইসলামের সর্বোচ্চ আলেম। যদিও পাকিস্থানের মুফতি–এ–আম হচ্ছেন মুফতি রাফিউদ্দিন উসমানী কিন্তু আমরা সহজেই মুফতি নিজামউদ্দিন শামজাইকে সমান মাপের বলতে পারি।"

৬। নফসে জিহাদ বড় জিহাদ!!

কেউ কেউ বলেন, নফসের জিহাদ বড় জিহাদ। এ বিষয়ে তারা একটি হাদীসও বর্ণনা করে থাকেন। একদল লোক জিহাদ থেকে ফিরে আসলে নাকি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উদ্দেশ্য বলেছিলেন,

قدمتم خير مقدم قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر مجاهدة العبد هواه

তোমরা খুব উত্তম স্থানেই ফিরে এসেছো তোমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে ফিরে এসেছো আর তা হলো অন্তরের সাথে জিহাদ করা। (দাইলামী, কানযুল উম্মাল, জামউল জাওয়ামি)

এই হাদীসের কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে,

رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر

“আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে ফিরে এসেছি।”

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) এই হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন,

فَلَا أَصْلَ لَهُ وَلَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِأَقْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالِهِ وَجِهَادُ الْكُفَّارِ مِنْ أَعْظَمِ الْأَعْمَالِ ؛ بَلْ هُوَ أَفْضَلُ مَا تَطَوَّعَ بِهِ الْإِنْسَانُ

এই হাদীসটির কোনো ভিত্তি নেই। আল্লাহর রসুলের কথা ও কাজ সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন এমন কেউ এটি বর্ণনা করেন নি। আর কাফিরদের সাথে জিহাদ করা সর্বত্তোম আমল সমূহের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। বরং এটি আল্লাহর ইবাদত সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। (মাজমুউল ফাতাওয়া)

তবে সহীহ হাদীসে আছেঃ

الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ

“মুজাহিদ সেই যে তার নাফসের সাথে জিহাদ করে।” (সুনান তিরমিজি)

অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে

وأفضل الجهاد من جاهد نفسه فى ذات الله عز وجل

“সর্বত্তোম জিহাদ হলো আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে অন্তরের সাথে জিহাদ করা।” (জামউল জাওয়ামি, কানযুল উম্মাল)

এই সহীহ হাদীস দুটির সাথে উপরে উল্লেখিত হাদীস দুটির পার্থক্য হলোঃ এখানে সরাসরি অন্তরের জিহাদকে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের তুলনায় বড় জিহাদ হিসাবে উল্লেখ করা হয়নি। শুধু বলা হয়েছে অন্তরের জিহাদ সর্বত্তোম জিহাদ।

এখন প্রশ্ন হলো অন্তরের জিহাদ বলতে আমরা কি বুঝবো? আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অন্তর যা অপছন্দ করে অন্তরের

অপছন্দ সত্বেও সেটা আদায় করাই কি অন্তরের জিহাদ নয়? যদি তাই হয় তবে আল্লাহ নিজে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ

“তোমাদের উপর কিতাল ফরজ করা হয়েছে যদিও তা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয়।” (সূরা বাকারা/২১৬)

অন্য কোনো আমলের ব্যাপারে আল্লাহ একথা বলেননি সুতরাং যত উত্তম কাজ আছে তার মধ্যে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মানুষের অন্তরের নিকট সর্বাপেক্ষা বেশি অপছন্দনীয় তাই যারা শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করছেন তারাই অন্তরের সাথে সর্বাপেক্ষা বেশি জিহাদ করছেন।

৭। প্রশ্নঃ জিহাদের জন্য পিতা-মাতার অনুমতি শর্ত কিনা।

উত্তরঃ সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الجِهَادِ، فَقَالَ: «أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ

“একব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে জিহাদে বের হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি তাকে বললেন তোমার পিতামাতা কি বেঁচে আছে? সে বলল, হ্যাঁ। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তবে তাদের নিকট জিহাদ করো।”

অন্য একটি হাদীসে এসেছে “রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো কোন আমল শ্রেষ্ঠ? তিনি প্রথমে বললেন সময় মতো নামাজ আদায় করা, পরে বললেন পিতা-মাতার সাথে ভাল আচরণ করা তারপর বললেন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।” (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

এই হাদীস দুটির মাধ্যমে অনেকে বিভিন্নরকম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে থাকেন এবং সর্বাবস্থায় জিহাদে যাওয়ার জন্য বাবা-মার অনুমতি জরুরী মনে করেন। আমরা অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরে লিখেছিঃ সাধারন অবস্থায় জিহাদ ফরজে কেফায়া কিন্তু বিশেষ কিছু অবস্থায় ফরজে আইন হয়ে যায়। জিহাদ যখন ফরজে কিফায়া থাকে এবং যথেষ্ট সংখক মুসলিম জিহাদে অংশগ্রহন করে তবে বাকীদের উপর জিহাদে অংশগ্রহন করা বাধ্যতামুলক থাকেনা তারা ইচ্ছা করলে অংশগ্রহণ করে গনীমত ও সূউচ্চ মর্যাদা হাসীল করতে পারে আবার ইচ্ছা করলে অংশগ্রহণ নাও করতে পারে। এই অবস্থায় পিতামাতার অনুমতি ছাড়া জিহাদ করা বৈধ নয়। কিন্তু জিহাদ যখন ফরজে আইন হয়ে যায় বা যথেষ্ট সংখক মুজাহিদ জিহাদে যোগদান না করেন, তখন জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। তখন পিতা মাতার অনুমতির কোনো প্রয়োজন নেই যেভাবে নামাজ, রোযার জন্য পিতামাতার অনুমতির প্রয়োজন হয় না। ইবনে হাযার আসকালানী (রঃ) বলেন,

قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ يَحْرُمُ الْجِهَادُ إِذَا مَنَعَ الْأَبَوَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَا مُسلمين لِأَنَّ بِرَّهُمَا فَرْضُ عَيْنٍ عَلَيْهِ وَالْجِهَادُ فَرْضُ كِفَايَةٍ فَإِذَا تَعَيَّنَ الْجِهَادُ فَلَا إِذْنَ

জমহুর আলেম বলেছেন পিতামাতা যদি মুসলমান হয় তবে তারা নিষেধ করলে জিহাদ করা বৈধ হবে না কেননা পিতামাতার সাথে সৎ ব্যবহার করা ফরজে আইন আর জিহাদ ফরজে কিফায়া। তবে যখন জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায় তখন কোনো অনুমতির প্রয়োজন নেই। (ফাতহুল বারী)

পরবর্তী হাদীসে যে জিহাদকে পিতামাতার সাথে সৎ ব্যবহারের পরে উল্লেখ করা হয়েছে এটাও ঐ অবস্থায় যখন জিহাদ ফরজে কিফায়া থাকে কিন্তু যখন জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায় তখন পিতামাতার খেদমতের চেয়ে জিহাদ করা অধিক ফজীলতের আমল হবে। এ বিষয়ে বহু হাদীস বর্ণিত আছে। যেমনঃ

جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد قال (لا أجده) . قال (هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر) قال ومن يستطيع ذلك

“একজন ব্যক্তি রসুলুল্লাহ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বলল হে আল্লাহর রসুল আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন যার মাধ্যমে আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত মুজাহিদদের সমান পুরুষ্কার পেতে পারি। তিনি বললেন, তুমি কি (মুজাহিদ ফিরে না আসা পর্যন্ত) অনবরত ক্লানি-হীনভাবে নামাজ আদায় করতে ও কোনোরুপ পানাহার ব্যতিরেখেই রোযা রাখতে সক্ষম? উক্ত ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রসুল, কে এই কাজ করতে সক্ষম? (সহীহ

বুখারী)

আর যদি আমরা মেনেও নিই যে পিতামাতার সাথে ভাল আচরন করা জিহাদের চেয়ে উত্তম তবে এর অর্থ কি এই যে পিতামাতার সাথে ভাল আচরণ করলেই জিহাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে। একই হাদীসে তো নামাজকে পিতামাতার সাথে ভাল আচরণের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ কি এ যে যেহেতু নামাজ পিতামাতার সাথে ভাল আচরণের তুলনায় উত্তম আমল তাই একজন মুসল্লির জন্য পিতামাতার খেদমতের প্রয়োজন নেই? একটি কাজ অন্য একটি কাজ থেকে উত্তম হলেই অন্য কাজটির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। বরং মুক্তি পেতে হলে প্রতিটি ফরজ দায়িত্বই নিষ্ঠার সাথে আদায় করতে হবে।

৮। জিহাদের জন্য একজন সর্বজনীন খলীফা বা বিশ্বনেতা থাকা কি শর্ত, নাকি স্থানীয়ভাবে আমীর নিয়োগ করে জিহাদ করা যায়?

সঠিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত খলীফা বা রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়া জিহাদ ফরজ হওয়ার ব্যাপারে আমরা পূর্বে কথা বলেছি। এখন প্রশ্ন হলো কোনো কারণে যদি সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এক নেতার অধীনে একত্রিত হতে সক্ষম না হয় তবে তাদের করণীয় কি? সকলে একত্রিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, নাকি একত্রিত হওয়ার চেষ্টা করার পাশাপাশি শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাবে?

প্রথমতঃ এ বিষয়ে সঠিক উত্তর পূর্বে বর্ণিত আবু বছীর (রাঃ) এর ঘটনাতে পাওয়া যাবে। যখন মক্কার কাফিরদের সাথে কৃত সন্ধির কারণে মদীনা রাষ্ট্রের সাথে মিলিত হওয়া সম্ভব হলোনা তখন তাঁরা কয়েকজন একত্রিত হয়ে স্থানীয়ভাবে শত্রুর মোকাবিলা শুরু করে দিলেন। স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের এ কাজে সন্তুষ্ট ছিলেন। বর্তমানেও যদি কোন কারণে মুসলিমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তবে তাদের করণীয় হলো একতাবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করা এবং সেই সাথে যে যেভাবে পারে স্থানীয়ভাবে একত্রিত হয়ে শত্রুর মোকাবিলা চালিয়ে যাওয়া। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

হে ঈমানদাগণ! তোমরা নিকটবর্তী কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করো আর তাদের প্রতি কঠোর হও। জেনে রাখো আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন। (সূরা তাওবাঃ ১২৩)

দ্বিতীয়তঃ যারা জিহাদ বৈধ হওয়ার জন্য খলীফার বিদ্যমান থাকাকে শর্ত করেন তাদের জন্য উহুদ যুদ্ধের ঘটনার মধ্যে শিক্ষনীয় কাহিনী বিদ্যমান রয়েছে।

انتهى أنس بن النضر عم أنس بن مالك إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله، في رجال من المهاجرين والانصار، وقد ألقوا بأيديهم فقال: فما يجلسكم ؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما تصنعون بالحياة بعده ! قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استقبل فقاتل حتى قتل

আনাস (রাঃ) এর চাচা আনাস ইবনে নাদর (রাঃ) উমর ইবনে খত্তাব, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ এবং অন্য কিছু মুহাজির ও আনসারদের নিকট পৌঁছালেন। তারা অস্ত্র ফেলে দিয়ে বসে পড়েছিলেন। তিনি বললেন তোমরা বসে আছো কেনো? তাঁরা বললেন আল্লাহর রাসুল নিহত হয়েছেন। তিনি বললেন, তাহলে তোমরা বেঁচে থেকে কি করবে? ওঠো! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কারণে জীবন দিয়েছেন তোমরাও সে কারণে জীবন দাও। তারপর তিনি চলে যান এবং যুদ্ধ করতে করতে নিহত হন। (বাইহাকী দালাইলুন নুবুওয়া, সিরাতে ইবনে হিশাম, সিরাতে ইবনে কাছীর ইত্যাদি)

একটি রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে আনাস ইবনে নাদর (রাঃ) বলেছিলেন,

يَا قَوْمُ إِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ قُتِلَ فَرَبُّ مُحَمَّدٍ لَمْ يُقْتَلْ فَقَاتِلُوا عَلَى مَا قَاتَلَ عَلَيْهِ

হে আমার সমপ্রদায়! যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিহত হয়েই থাকেন, তবে অনেক মুহাম্মাদই তো জীবিত রয়েছে। তিনি যে বিষয়ের উপর যুদ্ধ করেছেন তোমরাও তার উপর টিকে থেকে যুদ্ধ করে যাও। (ফাতহুল বারী, তাফসীরে তাবারী)

অর্থাৎ স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিহত হলেও জিহাদ বন্ধ করা হবে না, কারণ আল্লাহর রাসুলের জন্য

জিহাদ করা হয় না, বরং জিহাদ করা হয় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। এই হাদীসে প্রমাণ রয়েছে যে, যদি খলীফা বিদ্যমান না থাকে বা নিহত হন, তবে জিহাদ পরিত্যাগ করা হবে না।

তৃতীয়তঃ আল্লাহ বলেন,

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ

মুহাম্মাদ তো একজন রাসুল মাত্র, তার পূর্বেও বহু রাসুল গত হয়েছে। অতএব যদি তিনি মৃত্যুবরণ করেন বা নিহত হন, তবে কি তোমরা পিছনে ফিরে যাবে? (আলে ইমরানঃ ১৪৪)

অন্য একটি রেওয়ায়েতে এসেছে,

إن أول من سل سيفا في الله الزبير ابن العوام، بينا هو ذات يوم قائل إذ سمع نغمة: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج متجردا بالسيف صلتا، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم كنة كنة فقال: ما لك يا زبير؟ قال: سمعت أنك قتلت، قال: فما أردت أن تصنع؟ قال: أردت والله أستعرض أهل مكة! فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير

আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রথম যে তরবারী উত্তোলন করা হয়েছে তা যুবাইর ইবনে আওয়ামের তরবারী। একদিন তিনি দুপুরে বিশ্রামরত অবস্থায় ছিলেন তখন একটি আওয়াজ শুনলেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিহত হয়েছেন। তিনি দ্রুত খোলা তরবারী হতে বের হয়ে পড়লেন। পরে একস্থানে তার সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেখা হলে, তিনি (সাঃ) বললেন, হে যুবাইর! তোমার কি হয়েছে? তিনি বললেন আমি শুনলাম আপনাকে হত্যা করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে কারণে তুমি কি করতে চাচ্ছিলে? যুবাইর (রাঃ) বললেন, আমি মক্কার কাফিরদের দেখে নিতে চাচ্ছিলাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্য কল্যাণের দোয়া করলেন। (কানযুল উম্মাল, জামউল জাওয়মি)

এখন খলীফা নিহত হওয়ার খবর শুনলে মুসলিমদের কি করা উচিত? যারা খলীফাকে হত্যা করে পালাচ্ছে তাদের পিছু ধাওয়া না করেই কি মুসলিমরা আর একজন খলীফা নিয়োগে মনোনিবেশ করবে? খলীফার কারণে কি ইসলামের যাবতীয় কাজকর্মে ইস্তফা দিতে হবে? ইসলাম কি শুধু খলীফার জন্য?

চতুর্থতঃ যারা মনে করেন শত্রুর সাথে মুকাবিলা করার পূর্বে সমগ্র মুসলিমদের একজন খলীফার নিকট বায়াত হতে হবে এবং কোনো অবস্থাতেই স্থানীয়ভাবে একত্রিত হয়ে জিহাদ করা বৈধ হবে না, তাদের নিকট আমাদের প্রশ্নঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য নবীগণ জিহাদ করেছেন কি না? তাঁরা জিহাদ করে থাকলে তাদের জিহাদ বৈধ ছিল কি না? কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي

আমাকে পাঁচটি জিনিস দেওয়া হয়েছে যা আমার পূর্বে কাউকে দেওয়া হয়নি।

এরপর শাফায়াত, গনিমত ইত্যাদি বিষয়গুলি উল্লেখ করে সবার শেষে বলেন,

وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً

আর আমার পূর্বে সকল নবীকে তার সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে প্রেরণ করা হতো আর আমাকে সমস্ত মানুষের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

সুতরাং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য কোনো নবীকে সমগ্র বিশ্বের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়নি, বরং নির্দিষ্ট কোনো স্থান বা সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও বহু সংখ্যক নবী তাদের অনুসারীদের নিয়ে আশপাশের কাফিরদের সাথে লড়াই করেছিলেন। আল্লাহ বলেন,

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ اللَّهِ

কতো নবী রয়েছেন যাদের সাথে বহু সংখ্যক নেককার বান্দা যুদ্ধ করেছে! (সূরা আলে ইমরানঃ ১৪৬)

পঞ্চমতঃ হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বললেন, 'আমরা ক্ষতির মধ্যে ছিলাম পরে আপনার মাধ্যমে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়েছি। এই কল্যাণের পর আবার কোনো অকল্যাণ হবে কি?' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হ্যা।' তিনি (রাঃ) বললেন, 'তার পর আবার কোনো কল্যাণ আসবে কি?' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হ্যা, তবে তাতে কিছু ধোঁয়া থাকবে।' এভাবে কয়েকবার প্রশ্ন করার পর একসময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কোন অকল্যাণ হবে কি না এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন,

نَعَمْ، دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صِفْهُمْ لَنَا؟ فَقَالَ: «هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا» قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ؟ قَالَ «فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِك

'হ্যাঁ। একদল লোক জাহান্নামের দরজার দিকে ডাকবে। যারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে তাদের তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছাড়বে।' হুযাইফা (রাঃ) বলেন, "আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল! তাদের বৈশিষ্ট কি?' তিনি (সাঃ) বললেন, 'তারা আমাদের মতো হবে। আমাদের ভাষায় কথা বলবে।' আমি বললাম, 'আমি যদি সে সময় পাই, তবে আমাকে কি করতে আদেশ করেন?' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তুমি মুসলিমদের জামাত এবং তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরো।' 'আমি বললাম, যদি তখন মুসলিমদের কোনো জামাত বা ইমাম না থাকে?' তিনি বললেন, 'তবে গাছের শিকড় কামড়িয়ে হলেও মৃত্যু পর্যন্ত ঐ সকল দল হতে দূরে থাকো।'" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

হাদীসটির শেষে বলা হয়েছে,

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ؟

যদি তাদের কোনো জামাত বা ইমাম না থাকে?

এই প্রশ্নের উত্তরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তুমি শিকড় কামড়ে হলেও জাহান্নামের দিকে যারা ডাকছে তাদের সাথে মিলিত হয়ো না।' অর্থাৎ, যখন মুসলিমদের কোনো দল বা জামাত না পাওয়া যায় আমি আবার বলছি যদি মুসলিমদের কোনো দল বা জামাত না পাওয়া যায় তখন বাতিল ফিরকা থেকে দূরে থাকতে হবে। কিন্তু যদি মুসলিমদের কোনো জামাত পাওয়া যায় যাদের সাথে মিলিত হয়ে দ্বীনের খেদমত করা সম্ভব, তাহলে তাই করতে হবে।

জামাত অর্থ দল। মুসলিমদের জামাত অর্থ মুসলিমদের দল। একদল মুসলিম একত্রিত হয়ে কোন কাজ করতে চাইলে সেই দলটিকে মুসলিমদের জামাত বলা যেতে পারে। তাদের নাম যাই হোক, আর তাদের সংখ্যা যতই হোক। তারা বিশ্বব্যাপী প্রসারিত হোক বা কোনো স্থানে সীমাবদ্ধ হোক। তাদের কাজ ও দাওয়াত যদি সঠিক হয় এবং যারা জাহান্নামের দিকে ডাকছে তাদের মতো না হয়, তবে তাদের সাথে মিলিত হতে হবে। যেমনঃ আল্লাহ বলেন,

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

যখন তোমরা পানি না পাও, তখন পবিত্র মাটিতে তায়াম্মুম করো। (সূরা মায়েদাঃ ৬)

এই আয়াতে অর্থের ব্যাপারে সমস্ত আলেমরা একমত যে, পানি থাকা পর্যন্ত তায়াম্মুম করা যাবে না। তবে পানি যদি নাপাক হয় বা অন্য কোনো দোষে দুষ্ট হয় তবে ভিন্ন কথা। এখন যদি কেউ বলে, সমুদ্র যেহেতু বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত তাই সমুদ্র ছাড়া অন্য কোনো পানি দ্বারা ওযু করা যাবে না তবে তার কথাটি কেমন হবে? তার কথার উত্তরে বলা হবে, ওযু করার জন্য শর্ত হলো পানির প্রয়োজনীয়তা, তা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হোক বা একটি হ্রদের পানিই হোক। একইভাবে সত্য পথের দিকে আহবানকারী একদল মুসলিম পাওয়া গেলে তাদের সাথে একত্রে কাজ করতে হবে, তারা বিশ্বব্যাপী প্রসারিত হোক বা আসহাবে কাহফের মতো কোনো ছোট গুহাতে আশ্রিত হোক। আবু বছীর (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবাদের কর্মনীতি থেকেও বিষয়টি স্পষ্ট হয়। জিহাদের জন্য রাষ্ট্র, খিলাফত ইত্যাদিকে যারা শর্ত করেন, তারা সম্পূর্ণ বাড়তি বিষয় যোগ করেন যার কোনো দলীল নেই। এটা ঠিক যে, মুসলিমরা বিশ্বব্যাপী একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কাফেরদের পক্ষ হতে আরোপিত বাধা-বিঘ্নের কারণে বা অন্য কোন কারণে যদি তারা বিশ্বব্যাপী একতাবদ্ধ হতে সক্ষম না হয়, তবে যতদিন একতাবদ্ধ হওয়া সম্ভব না হয়, ততদিন কাফেরদের সুযোগ দিতে হবে- এমনটি নয়। বরং স্থানীয়ভাবে কোনো একজন আমীরের নেতৃত্বে একতাবদ্ধ হয়ে কাফেরদের মুকাবিলা করতে হবে, এবং সর্বদা অন্য হক্বপন্থীদের সাথে মিলিত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। যেমনটি আবু বছীর (রাঃ) ও তার সঙ্গী-সাথীদের ক্ষেত্রে হয়েছিল। তাঁরা আল্লাহর রাসুলের (সাঃ) সাথে মিলিত হতেই চাচ্ছিলেন, কিন্তু কাফিররা তাঁদের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ালে তাঁরা আল্লাহর রাসুলের (সাঃ) সাথে মিলিত হওয়ার পূর্বেই সেই বাধাদানকারী কাফেরদের উপর আক্রমণ করতে থাকলেন। জিহাদ নিজেই একটি ওয়াজিব দায়িত্ব। খলীফা না থাকলে যেমন নামাজ, রোযা পরিত্যাগ করা হয় না, তেমনি জিহাদও পরিত্যাগ করা হবে না। ইবনে কুদামা (রঃ) বলেন,

فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد لأن مصلحته تفوت بتأخيره وإن حصلت غنيمة قسمها أهلها على موجب الشرع

যদি ইমাম না থাকে, তবু জিহাদ পিছিয়ে দেওয়া হবে না। কেননা এর ফলে জিহাদের কল্যাণ থেকে মানুষ বঞ্চিত হবে। যদি কোন গনীমত পাওয়া যায়, তবে মুজাহিদগণ শরীয়ত অনুসারে নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নেবে। (মুগনী)

৯। খিলাফা আলা মিনহাযিন নুবুওয়া ছাড়া জিহাদ করা যায় কিনা?

প্রথমতঃ এটা নিশ্চিত যে, কোন শাসন ব্যবস্থাকে খিলাফা আলা মিনহাযিন নুবুওয়া বা নবুয়্যতী আদলের খিলাফত হিসাবে গন্য করতে হলে সেটির বহু সংখক গুণ বর্তমান থাকতে হবে। খুলাফায়ে রাশেদার শাসন আমলে যেসব নীতিমালার আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনা করা হতো সেগুলোকে অনুসরণ করতে হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাতের পর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিমরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে রাজত্ব করেছে কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের অতি অল্প অংশকেই সঠিক অর্থে নবুয়্যতী আদলের খিলাফত (خلافة علي منهاج النبوة) হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا

আমার পর আমার উম্মতের মধ্যে খিলাফত থাকবে ত্রিশ বছর, পরে রাজতন্ত্র শুরু হবে। (ইবনে হিব্বান, শুয়াইব আল-আরনাউত সহীহ বলেছেন, আলবানী জামি' আস-সগীরে সহীহ বলেছেন/৫৬৫২)

একই ধরনের হাদীস আবু দাউদ ও মিশকাতে বর্ণিত আছে।

এই সকল হাদীসের শেষে উল্লেখ আছে যে রাবী আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী (রাঃ) এই চার খলীফার শাসনকাল গননা করে দেখিয়ে দিয়েছেন। মুয়াবিয়া (রাঃ) একজন সাহাবী হওয়া সত্বেও তাঁর সময়কে একদিকে যেমন খিলাফা আলা মিনহাজিন নুবুয়্যা বা নবুয়্যতের আদর্শে খিলাফত বলা হয়না তেমনি তাকে খুলাফায়ে রাশেদার মধ্যেও গন্য করা হয়না। তাঁর পরবর্তী উমাইয়া শাসকদের অবস্থা আরো শোচনীয়। তবে উমর ইবনে আব্দুল আজীজকে পঞ্চম খলীফা এ রাশেদা মনে করা হয়। বহু সংখ্যক সাহাবী খুলাফায়ে রাশেদার পরবর্তী যুগ তথা উমাইয়া শাসন আমল পেয়েছেন, তাঁরা সেসময় ঐসকল খলীফাদের অধীনে জিহাদ করেছেন। শুধু এতদূরই নয় বরং স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসান ইবনে আলী (রাঃ) এর উদ্দেশ্যে বলেন,

إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين

আমার এই ছেলে একজন নেতা। আল্লাহ এর মাধ্যমে মুসলিমদের দু'টি বড় দলের মধ্যে সন্ধি ঘটাবেন। (সহীহ বুখারী)

এই কথাটি একটি লম্বা হাদীসের অংশ যেখানে বলা হয়েছে আলী (রাঃ) এর মৃত্যুর পর যখন হাসান (রাঃ) খলীফা হলেন তখন এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মুয়াবিয়া (রাঃ) এর সাথে যুদ্ধের জন্য রওনা হলেন। মুয়াবিয়া (রাঃ) যুদ্ধের পরিনাম অনুভব করতে পারলেন। তিনি হাসান (রাঃ) এর নিকট সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে দু'জন লোক পাঠালেন। হাসান (রাঃ) সন্ধিতে রাজি হয়েছিলেন। হাদীসে এই ঘটনা সম্পর্কেই ভবিষ্যৎ বানী করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ঘটনাকে প্রশংসা করেছেন অথচ এই ঘটনার মাধ্যমে সমগ্র মুসলিম জাহানে মুয়াবিয়া (রাঃ) এর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, পরিপূর্ণ নবুয়্যতী আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত না হলেও কোনো শাসনব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে কল্যাণকর হতে পারে। যেহেতু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসান (রাঃ) এর পক্ষ থেকে মুয়াবিয়া (রাঃ) এর হাতে বায়াত হওয়াকে (إصلاح) বা সংশোধন ও কল্যাণ হিসাবে গণ্য করেছেন। অথচ সহীহ হাদীস দ্বারাই প্রমানিত যে মুয়াবিয়া (রাঃ) এর শাসনকাল খিলাফত আলা মিনহাযিন নুবুওয়া বা পরিপূর্ণভাবে নবুয়্যতী আদর্শের খিলাফত নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হলো এটা দেখানো যে, কোনো শাসন ব্যবস্থা পরিপূর্ণ নবুয়্যতী আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত না হলেও তুলনামূলকভাবে উত্তম ও কল্যাণময় হিসাবে গন্য হতে পারে, যদি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করা হয় এবং উক্ত শাসকের নেতৃত্বে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করে মুসলিম উম্মাহকে নিরাপত্তা দেওয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ সহীহ মুসলিম থেকে জানা যায়,

أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، وَقَالَ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ

যদি আমাদের উপর এমন নেতারা কর্তৃত্ব পায় যারা আমাদের থেকে তাদের পাওনা আদায় করে কিন্তু আমাদের হক আদায় করে না, তবে আপনি আমাদের কি করতে আদেশ করেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখ ফিরিয়ে নিলেন। প্রশ্নটি দুইবার বা তিনবার করা হলে তিনি বললেন, তাদের কথা শোনো এবং তাদের আনুগত্য করো, কেননা তাদের যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে তাদের প্রশ্ন করা হবে এবং তোমাদের যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে তোমাদের প্রশ্ন করা হবে। (সহীহ মুসলিম)

এখানে জালিম আমীর ওমারাদের কথা বলা হচ্ছে। এরা কখনও খুলাফায়ে রাশেদা খেতাব পেতে পারে না, এদের শাসন পদ্ধতিকে নবুয়্যতী আদলের খিলাফত বা খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়া বলা যায় না, তবু এদের আনুগত্য করতে বলা হচ্ছে। আর এখানে আনুগত্য অর্থ হলো শুধুমাত্র ভাল কাজে আনুগত্য যেহেতু অন্য হাদীসে বলা হয়েছে,

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির কোনো আনুগত্য নেই। (মিশকাত)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) যখন আমীরের আনুগত্য সংক্রান্ত – হাদীসটি বললেন তখন একজন বলল,

هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ، يَأْمُرُنَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ، وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا، وَاللهُ يَقُولُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

এই যে তোমার চাচাতো ভাই মুয়াবিয়া আমাদের একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষন করতে এবং পরস্পরকে হত্যা করতে আদেশ করে, অথচ আল্লাহ বলেনঃ ‘হে ঈমানদাররা তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষন করো না তবে উভয়ের সম্পত্তিতে বেচা-কেনা হলে ভিন্ন কথা। আর নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর দয়ালু।’

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বললেন,

أَطِعْهُ فِي طَاعَةِ اللهِ، وَاعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ

আল্লাহর আনুগত্যের বিষয়ে তার আনুগত্য করো, আর সে আল্লাহর অবাধ্য হবার আদেশ দিলে তার অবাধ্য হও। (সহীহ মুসলিম)

সুতরাং জালিম আমীর ওমারাদের সঠিক অর্থে খলীফা বা অন্তত খলীফা এ রাশেদ বলা যায়না, তাদের শাসন ব্যবস্থাকে নবুয়্যতী আদলের খিলাফত বলা যায়না, কিন্তু তবু সৎকাজে তাদের আনুগত্য করে যেতে হবে। যেহেতু জিহাদ একটি সৎকাজ, সে কারণে এসকল নেতার নেতৃত্বে জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। অন্য একটি হাদীসে এসেছে,

وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِي اللَّهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ، وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ

যেদিন থেকে আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন সেদিন থেকে আমার উম্মতের শেষ দলটি দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত জিহাদ চলতে থাকবে। কোনো জালিমের জুলুম বা কোনো নেক ব্যক্তির ন্যায়-নিষ্ঠতা একে বন্ধ করতে পারবে না। (আবু

দাউদ, মিশকাত)

হাদীসটি সনদের দিক হতে দূর্বল কিন্তু এর অর্থ অন্যান্য হাদীস দ্বারা সমর্থিত সে কারণে ইমাম বুখারী এই কথাটিকে সহীহ বুখারীর তরজমাতে উল্লেখ করেছেন।
(সহীহ বুখারী / كتاب الجهاد والسير/ باب الجهاد ماض مع البر والفاجر)

সুতরাং জিহাদ বৈধ বা ফরজ হওয়ার জন্য নবুয়্যতী আদর্শের খিলাফত বা পরিপূর্ণ সত্য পথের উপর প্রতিষ্ঠিত খলীফা বিদ্যমান থাকতে হবে এটা শর্ত নয়।

১০। রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়া জিহাদ করা যায় কিনা?

সৌদি রাজপরিবারের ভক্ত তথাকথিত অনেক আলেম জিহাদের জন্য একটা আজব শর্ত যোগ করেনঃ তা হলো জিহাদের জন্য নাকি রাস্ট্রক্ষমতা থাকা জরুরী।

প্রথমতঃ এসব 'আজব আলেম'দের পূর্বে কোন সলফে সালেহীন এ রকম 'আজব কথা' বলেন নি।

তারা অনেক ব্যাপারে সলফে সালেহীনদের অনুসরণের দাবী করলেও জিহাদের ক্ষেত্রে সলফে সালেহীনদের বাদ দিয়ে শুধুমাত্র সৌদি রাজার গুনগ্রাহী আলেমদেরকে অনুসরণ করেন।

দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়াই একত্রিত হয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার দলীল হলো সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আবু বছীর (রাঃ) এর ঘটনা। যেখানে বলা হয়েছে হুদাইবিয়ার সন্ধির পর যখন মক্কা থেকে পালিয়ে আসা মুসলমানদেরকে মদীনা থেকে মক্কায় ফেরত দেওয়া হলো। সে সময় আবু বছীর (রাঃ) মদীনাতে পালিয়ে আসেন। তখন কাফিরদের পক্ষ থেকে দুজন দূত তাকে নিতে আসলে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে তাদের হাতে তুলে দেন। পথিমধ্যে তিনি তাদের একজনকে হত্যা করেন এবং আবার মদীনাতে ফিরে আসেন। তাঁকে দেখে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ، لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ

'কি আশ্চর্য ! এ তো যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে সক্ষম। যদি এর সাথে কেউ থাকতো!'

এ কথা শুনে আবু বছীর (রাঃ) বুঝতে পারেন যে, তাকে আবার মুশরিকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তাই তিনি বের হয়ে পড়েন এবং সিফাল বাহর নামক এলাকাতে অবস্থান নেন। পরবর্তীতে মুসলমানরা একের পর এক মক্কা থেকে পালিয়ে এসে আবু বছীর (রাঃ) এর সাথে মিলিত হতে থাকেন। তারা মক্কার যে কোনো ব্যবসায়ী কাফেলার কথা শুনলে তার উপর হামলা করে তাদের হত্যা করতেন এবং তাদের সম্পদ কেড়ে নিতেন। পরে কুরাইশরা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিকট পত্র লিখে সন্ধির উক্ত শর্তটি বতিল করার অনুরোধ জানায়। (সহীহ বুখারী)

এই হাদীসে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়,

ক) বিশ্ব নেতা বা খলীফা অনুপস্থিত না থাকলে বা তাঁর সাথে যোগাযোগ সম্ভব না হলে স্থানীয়ভাবে আল্লাহর শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করা যায়। কেননা আবু বছীর বা অন্য যেসব সাহাবা উক্ত স্থানে একত্রিত হয়েছিলেন তাদের কেউই খলীফা ছিলেন না। আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেঁচে থাকতে এমন দাবী কখনই যৌক্তিক হতে পারে না। আবার তারা মদীনা রাষ্ট্রের অনুগত নাগরিকও ছিলেন না। তাহলে তারা কুরাইশদের সাথে মদীনা রাষ্ট্রের সন্ধিকে মানতে বাধ্য থাকতেন। তারা যা করেছেন সে বিষয়ে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নির্দেশ দেন নি। এসকল সাহাবাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বা নিয়ন্ত্রিত ভূখন্ড ছিল না। এসবই স্পষ্ট প্রমাণ করে যে জিহাদ করার জন্য একজন খলীফা থাকতে হবে বা রাষ্ট্র থাকতে হবে এটা শর্ত নয়।

অনেকে বলতে পারেন এ ঘটনা একদল সাহাবাদের আমল বর্ণনা করে এটা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা বা কাজ নয়। এর উত্তর হলো রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এ খবর পৌঁছে ছিল কিন্তু তিনি এর নিন্দা করেননি। তাছাড়া রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা,

لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ

যদি এর সাথে কেউ থাকতো!

এই অংশের ব্যাখ্যায় ইবনে হাজার আল আসকালানী (রঃ) বলেন,

لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ أَيْ يَنْصُرُهُ وَيُعَاضِدُهُ وَيُنَاصِرُهُ وَفِي رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ لَوْ كَانَ لَهُ رِجَالٌ فَلُقِّنَهَا أَبُو بَصِيرٍ فَانْطَلَقَ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَيْهِ بِالْفِرَارِ لِئَلَّا يَرُدَّهُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَرَمَزَ إِلَى مَنْ بَلَغَهُ ذَلِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَلْحَقُوا بِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ يَجُوزُ التَّعْرِيضُ بِذَلِكَ لَا التَّصْرِيحُ كَمَا فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

যদি তার সাথে কেউ থাকতো অর্থাৎ যদি তাকে কেউ সাহায্য ও সহযোগীতা করতো। ইমাম আওযাঈ (রঃ) এর রেওয়ায়েতে আছে যদি তার সাথে কিছু লোক থাকতো। এই কথাটি আবু বছীর (রাঃ) কে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে তিনি ফিরে গেছেন। এই কথার মধ্যে ইঙ্গিতে তাঁকে পালিয়ে যেতে বলা হয়েছে যাতে তাকে মুশরিকদের নিকট ফিরিয়ে দিতে না হয় এবং মক্কার অন্যান্য মুসলিমদের মধ্যে যার নিকট এই কথা পৌঁছায় তাকে আবু বছীরের সাথে মিলিত হওয়ার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। শাফিঈ মাযহাব ও অন্যান্য বেশিরভাগ আলেমরা বলেছেন (সন্ধি থাকা অবস্থায়) এধরনের কথা আকার ইঙ্গিতে বলা যেতে পারে যেমনটি এই ঘটনায় রয়েছে তবে সরাসরি নয়। (ফাতহুল বারী)

তৃতীয়তঃ রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়াও যে জিহাদ ফরজ হয় এ বিষয়ে আর একটি দলীল হলো উবাদা ইবনে সমিত (রাঃ) বর্ণিত হাদীস,

وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট অঙ্গিকার নিয়েছিলেন যে, আমরা ক্ষমতাশীনদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবো না যতক্ষন না তারা স্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হয় যে বিষয়ে আমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে প্রমান বিদ্যমান আছে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

এই হাদীসের ভাষ্য হলো ক্ষমতাশীন খলীফা বা বাদশা যদি কুফরীতে লিপ্ত হয় তবে তখনি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ওয়জিব হবে।

ইমাম নববী (রঃ) বলেন,

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَةَ لَا تَنْعَقِدُ لِكَافِرٍ وَعَلَى أَنَّهُ لَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ الْكُفْرُ انْعَزَلَ

কাজী ঈয়াদ বলেছেন আলেমরা ইজমা করেছেন যে, কোনো কাফির মুসলিমদের ইমাম (খলীফা) হতে পারে না আর যদি পরবর্তীতে কোনো খলীফা কাফির হয়ে যায় তবে তাকে পদচুত করতে হবে। (শরহে মুসলিম)

এখন একটু চিন্তা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ধরুন মুসলিম জাহানের একজন খলীফা রয়েছেন। মুসলিমরা তার আনুগত্য করে চলেছে। এখন যদি হঠাৎ উক্ত খলীফা কাফির হয়ে যায় এবং অস্ত্র বলে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায় তবে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ হলো ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী মুসলিমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এখানে রাষ্ট্র ক্ষমতা কিন্তু উক্ত মুরতাদ শাসক ও তার সমর্থকদের দখলে আর মুসলিমরা রাষ্ট্র ক্ষমতাহীন। একজন কাফিরকে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে হটিয়ে একজন মুসলিমকে সে স্থানে বসানোর জন্য মুসলিমরা যুদ্ধ করবে। তাহলে এ হাদীস এবং উম্মতের ইজমা থেকে রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়াই জিহাদ শুধু বৈধ নয় বরং ওয়াজিব প্রমানিত হচ্ছে।

যারা মনে করেন হাদীসে কেবল খলীফা মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে অপসারনের কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য মুরতাদ

শাসকদের অপসারনের প্রয়োজন নেই। এটা যেমন একদিকে হাদীসের শব্দের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক অন্যদিকে যুক্তির দিক থেকেও হাস্যকর। হাদীসে বলা হয়েছে,

وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট অঙ্গিকার নিয়েছিলেন যে আমরা ক্ষমতাশীনদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবো না যতক্ষন না তারা স্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হয় যে বিষয়ে আমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে প্রমান বিদ্যমান আছে।

প্রথমে বলা হয়েছে (وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ) আমরা ক্ষমতাশীনদের সাথে লড়াই করবো না। এখানে খলীফা (خليفة) বা খিলাফত (الخلافة) শব্দ ব্যাবহার করা হয়নি বরং (الامر) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ ক্ষমতা আর (أهل الأمر) শব্দের অর্থ ক্ষমতাসীন। এক কথায় হাদীসের প্রথম অংশে যে কোনো ধরনের ক্ষমতাসীনদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। পরে বলা হয়েছে (إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا) যতক্ষন না তোমরা স্পষ্ট কুফরী দেখতে পাও। তাহলে ক্ষমতাসীন যে কারো মধ্যে স্পষ্ট কুফরী দেখলে পেলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলা হচ্ছে। সে খলীফা হোক বা বাদশা হোক বা জন্মগতভাবেই কাফির হোক।

এখন যদি কেউ বলেন হাদীসে তোমরা ক্ষমতাশীনদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়োনা বলতে ক্ষমতাসীন খলীফাকে বুঝানো হচ্ছে। এবং স্পষ্ট কুফরী দেখতে পেলে যুদ্ধ করার যে বৈধতা দেওয়া হয়েছে সেটাও খলীফা যখন কুফরী করে তখন প্রযোজ্য, অন্য শাসকদের ক্ষেত্রে নয়। তাদের জন্য কথা হলোঃ যদি হাদীসের প্রথম অংশে ক্ষমতাশীনদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়োনা বলতে শুধু খলীফাকে বুঝানো হয় তাহলে তো খলীফা ছাড়া অন্যান্য শাসকদের সাথে যুদ্ধ করা এমনিতেই প্রমানিত হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ হাদীসের অর্থ হবে ক্ষমতাশীন খলীফার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ো না যতক্ষন না তার মধ্যে কুফরী দেখা যায়। আর অন্যান্য শাসক যারা খলীফা নয় তাদের বিরুদ্ধে যে কোনো সময়ই যুদ্ধ করতে পারো। একটু চিন্তা করলেই বিষয়টি বোঝা যাবে।

১১। দাওয়াহ এর ক্ষেত্রে অনুসরনীয় বিষয়াবলীঃ

১) ফুরুয়ী ইখতিলাফী ছোট-খাট বিষয়ে বাড়াবাড়ি করবেন না, মূল বিষয় সমূহে যথাঃ তাওহীদ, শিরক, কুফর, রিদ্দা, জিহাদ ইত্যাদিতে মনোযোগ দিন।

২) সবার আগে নিজ আত্নীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত জনের কাছে তাওহীদের ও জিহাদের দাওয়াহ পৌঁছে দিন।

৩) দাওয়াকে সহজভাবে উপস্থাপন করুন যেমনভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাওয়াহ দিয়েছেন।

৪) কেউ প্রাথমিক দাওয়াহ কবুল করার পর তাকে ইসলামী ও জিহাদী সাইটের দেয়া বই, অডিও, ভিডিও অধ্যয়ন করতে দিন। এগুলো অধ্যয়ন শেষ হলে তাকে আনসার বা মুহাজির হিসাবে গড়ে তুলুন। নিয়মিত তালিম, তারবিয়া জারি রাখুন।

৫) আপনি যথাসম্ভব দাওয়াহ রিসোর্স (এই সাইটে দেয়া বই, অডিও, ভিডিও) ছড়িয়ে দিন। বই কিনে বন্টন করুন, মোবাইলের মেমোরী কার্ড কিনে সেটাতে ইসলামী ও জিহাদী সাইটের অডিও, ভিডিও কপি করে বন্টন করুন, সিডি, ডিভিডি আকারে এই বই, অডিও, ভিডিও বিতরণ করতে থাকুন।

৬) ইয়াহু বা গুগল গ্রুপ, ই-মেইল, ফেইসবুক, বাংলা ব্লগ ইত্যাদির মাধ্যমে ইন্টারনেটে এই দাওয়াহ, বই, প্রশ্নোত্তর, অডিও, ভিডিও ছড়িয়ে দিন (যাদের পক্ষে সম্ভব) বিশেষতঃ সবাইকে 'বাব-উল-ইসলাম' এবং 'আনসার আল মুজাহিদীন' ফোরামের সদস্য করুন ।

৭) স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি এবং মাদ্রাসাতে এই দাওয়াহ কার্যক্রম ছড়িয়ে দিন ।

৮) দাওয়াহ ওজিহাদের ক্ষেত্রে একজন আলেম-মুফতি অনেক গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করতে পারেন। সুতরাং তাদের নিকট হক্ক দাওয়াহ পৌঁছে দিন এবং তাঁরা যেন এই দাওয়াহ ছড়িয়ে দেন, মসজিদের মিম্বর থেকে তাওহীদ ও জিহাদের কথা বলেন – সেজন্য তাঁদেরকে উৎসাহিত করুন ।

৯) যাদের আপনি দাওয়াহ দিবেন তাদেরকে নিয়ে ৫-১০ জনের একটি করে সার্কেল গড়ে তুলুন। প্রতি সার্কেলে একজন দ্বায়িত্বশীল ঠিক করে দিন, সেই দ্বায়িত্বশীলের মাধ্যমে তাদের ইলম, তারবিয়্যাহ, দাওয়াহ, জিহাদের প্রস্তুতি ইত্যাদি চালিয়ে যান। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার পরামর্শ–নাসীহাহ এই সাইটে পাবেন ইনশাআল্লাহ।

১০) দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল সফর করুন, এসব এলাকার অবস্থা দেখুন, দাওয়াহ ছড়িয়ে দিন, অভিজ্ঞতা অর্জন করুন।

১১) ফিক্বহী মাসয়ালা আলেমদের কাছে নিয়ে যান, নিজে ফতোয়া বের করার চেষ্টা করবেন না।

১২) এই মুরতাদ সরকার ও কুফরী দলগুলোর শিরক-কুফর সবার কাছে বেশী বেশী প্রকাশ করুন।

১৩) আমেরিকার কুফর-ফাসাদকে সবার সামনে বেশী বেশী তুলে ধরুন আর এই মুরতাদ সরকার গুলো যে তাদের 'হাতের পুতুল' সেটা সবাইকে বুঝিয়ে বলুন।

১৪) বাংলাদেশে ইসলামী শরীয়াত কায়েম করা ফরজে আইন এবং এর জন্য জিহাদ-কিতাল হচ্ছে প্রধানতম উপায় – এই কথাটি সবার মাঝে বেশী বেশী প্রকাশ করতে থাকুন।

১৫) যে, যে মাজহাবে আছেন তাকে সেটাতে রেখেই জিহাদে শরীক করার চেষ্টা করুন, সবাইকে আপনার অনুসৃত মাজহাব-মাসলাকে শরীক করানোর চেষ্টা করবেন না।

১৬) জিহাদী নাশিদ, অডিও, ভিডিও তৈরী করা শিক্ষা করুন। এ ব্যাপারে আপনি কাজ করতে পারলে 'বাব-উল-ইসলাম' ফোরাম অথবা ইসলামী ও জিহাদী সাইটে যোগাযোগ করুন, পরামর্শ নিন (যাদের পক্ষে সম্ভব)

১৭) যথাসম্ভব আরবী ও উর্দু ভাষা শিক্ষা করার চেষ্টা করুন।

১৮) বাচ্চাদেরকে মাদ্রাসা শিক্ষায় দিন বিশেষত কওমী মাদ্রাসায় দিন, অন্যদেরকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করুন।

১৯) দ্বীনকায়েমের এই জিহাদে যে যতটুকু সমর্থন করতে চায়, তাকে ততটুকু সহ কাজে শরীক রাখুন। একসময় ইনশাআল্লাহ সে আরো উত্তমভাবে জিহাদের কাজে শরীক হয়ে যাবে। কেউ যদি শুধু আপনার জন্য দুয়া করতে রাজী থাকে, তাকে ততটুকুই করতে বলুন।

২০) পুরো মুসলিম উম্মাহকে নিয়ে চিন্তা করুন, শুধু পরিচিত হাতে-গুনা কিছু ভাইকে নিয়ে চিন্তা সীমাবদ্ধ রাখবেন না।

২১) তাকফীরের বাড়াবাড়ির ব্যাপারে সতর্ক থাকুন।

২২) ওয়াদা, আমানত দারিতা, আহাদ ইত্যাদি ঠিক রাখুন। রসিকতা করেও মিথ্যা কথা বলবেন না।

২৩) মহিলাদের কে তাদের যথাযথ মাকামে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন।

১২। আমি কেন আল-কায়িদা কে বাছাই করলাম?

আজকের কারণসমূহঃ

১। তাদের মধ্যে বিজয়ী দলের গুণাবলী সমূহ রয়েছে।

২। তারা আমাদের সময়েরআল-গুরাবাহ্।

৩। তারা মিল্লাতে ইব্রাহীম অনুসরণ করতে পেরে সবচেয়ে বেশি আনন্দিত।

১. কারণ, বিজয়ী দলের যে বৈশিষ্ট্য সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

তা তাদের এবং তাদের মত অন্যান্য মুজাহিদীন-যারা হক্ব প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছে- তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। উক্ববা ইব্ন আমর (রাঃ) বলেছেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "আমরা উম্মাহর মধ্যে একটি তাঈফা (ক্ষুদ্র দল) আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করতে থাকবে। তারা কাফেরদের উপরে বিজয়ী থাকবে এবং তাদের বিরুদ্ধাচারণ কারীদের পক্ষ থেকে কেউই তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, যতদিন পর্যন্ত না বিচার দিবস সংগঠিত হয়।" এই হাদীসের মধ্যে তাদের বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে আর তা হল তারা হক্বের জন্য জিহাদ করবে। যদি আজকের সময়ের দিকে আমরা লক্ষ্য করি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে, (আল্লাহর অনুগ্রহে) একমাত্র আল-কায়দাই হচ্ছে সসস্ত্র জিহাদের বাহিনী গুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী বাহিনী, যারা হক্বের পক্ষে জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছে। প্রমাণস্বরূপ, তারা আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইরাক এবং আল-শাবাব আল-মুজাহিদীনগণ সোমালিয়ায় জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছে। ঠিক একইভাবে, তারা জাজিরাতুল আরবের মুরতাদরশাসকদের বিরুদ্ধে এবং ইসলামিক মাগরিবেও জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছে।

এটি একটি সুস্পষ্ট বর্ননা যা সকল মুজাহিদীনদের সবচেয়ে বেশি আনন্দিত করে। যারা জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে অথবা বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে তা ভুলে গিয়েছে, এই হাদীসটি তাদের জন্য প্রযোজ্য হবেনা। কিছু মানুষ এমনও আছে যারা প্রকাশ্যে তা পরিত্যাগ করছে এবং এই হতাশা ছড়ানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে যে, আমাদের এই যুগে জিহাদের কোন প্রয়োজন নেই।

নিরপেক্ষ ভাবে বলতে গেলে, কিছু ইসলামিক দল এবং শাইখগণ এই হাদীসটিকে অগ্রাযা করে থাকেন। আমরা বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন জায়গায় শুনে থাকি, বিভিন্ন শাইখ বলেন, "একটি দল অবশিষ্ট থাকবে …"অথচ তারা এই বর্ণনার অপর অংশ "তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে" মানুষের সামনে বলনে না, যেন এটি সহীহ্ মুসলিমেরই কোন অংশ নয়!

একদা আমি উত্তর ইয়েমেনের একটি প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছিলাম। কোন এক ভাই যিনি হয়তবা জ্ঞান আহরণের জন্য এসেছিলেন, তিনি আমার কাছে এসে সহীহ্ মুসলিমের এই বর্ণনাটি খুলে দেখিয়ে বলতে লাগলেন, 'কেন আমাদের আলেমগণ এই বর্ননাটি উল্লেখ করেন না?'

আমার প্রিয় ভাইয়েরা, এটা হচ্ছে যথাযথ বর্ণনা যা একমাত্র এই পথের অনুসারীগণ ছাড়া আর কেউ তা দাবী করতে পারে না। আল্লাহর অশেষ রহমত যে, তিনি তাঁর রাসূল ﷺ -এর মাধ্যমে বলিয়েছেন, 'ইউক্বতিলুন' (তারা কিত্বাল করবে) যার আর কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। যদি এই বর্ননাটিতে 'ইউজাহিদুন' (তারা চেষ্টা-সাধনা করবে) উল্লেখ থাকতো,তখন হয়তবা কিছু মানুষ এটি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অন্য কিছু বলার চেষ্টা করত। তা সত্ত্বেও, তাদের কিছু অনুসারী এই হাদীসটির অপব্যাখ্যা করার জন্য চেষ্টা করে; আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন শক্তি ও সামর্থ্যনেই।

আল-কায়দার এক ভাই আমাকে এ প্রসঙ্গে বলেছিল যে, তিনি অন্য একটি দলের সাথে আলাপ চলাকালীন সময়ে বলেছিলেন,

“(আল্লাহর অনুগ্রহে) আমরাই হচ্ছি হক্কের উপরে কারণ রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘ইউক্বতিলুন’ (তারা ক্বিতাল করবে)।” কিন্তু অন্য ভাইটি প্রতিউত্তরে বলল, “আসলে ‘ইউক্বতিলুন’ শব্দটি দ্বারা ‘ইয়াদা‘য়ূন’ (তারা দাওয়াহ্ দিবে) বুঝানো হয়েছে।” তখন আল-কায়দার ভাইটি বললেন, “যদি তুমি এর কোন দলিল দেখাতে পারো যে ‘ইউক্বতিলুন’ শব্দটি আরবী ভাষায় ‘ইয়াদা‘য়ূন’ বুঝায়, তাহলে আমি আল-কায়দার মানহাজ পরিত্যাগ করবো।’

সুতরাং আল্লাহ্ আপনাকে হিফাযত করুন। লক্ষ্য করুন, কিভাবে তারা মূল শব্দটিকে অপব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে, যদিও বাহ্যিক ভাবে এর অর্থ তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে না। আর এটাই হচ্ছে সত্য পথ। জিহাদের পথে কাঠিন্য যেন কাউকে বিরত না রাখে, কেননা জিহাদ-ই বিজয়ী দলের বৈশিষ্ট্য ।

২. কারণ, তারা হচ্ছে আগন্তুক (আল-গুরাবাহ্)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল ﷺ বলেন, “ইসলাম শুরু হয়েছিল আগন্তুকের ন্যায় এবং আবার সেই আগন্তুক হয়েই ফিরে যাবে। সুতরাং সুসংবাদ দাও সেই সকল আগন্তুকদের।”

অতঃপর, হক্কের অনুসারীদের অবস্থান বর্ননা করতে গিয়ে এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, তারা হবে সবার থেকে আলাদা। এতে কোন সন্দেহ নেই, যে ব্যক্তি এমন ভীতির সাথে বেঁচে আছে যে তাকে তার আক্বীদাহ্ এবং জিহাদের কারণে হত্যা করা হতে পারে; সত্যিকার অর্থে সেই অবস্থান করছে আগন্তুকের ন্যায়। সে সবার থেকে আলাদাভাবে অবস্থান করে, কারণ তাকে তার প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিপরীত আক্বীদাহর জন্য দোষারোপ করা হয়ে থাকে। আর অন্য কোন কারণে নয় বরং সে এমন যুগে হক্কের উপর অবিচল আছেন, যখন এর সহযোগী সংখ্যা দিনের পর দিন কমেই যাচ্ছে। সত্যিকার অর্থে, সেই হচ্ছে আগন্তুক।

সে এমন ভীতিকর অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে যে, হয়তবা তার ফোনের উপর নজর রাখা হচ্ছে অথবা তার গাড়ির পেছনে সার্বক্ষণিক লোক লাগিয়ে রাখা হয়েছে। সে যে কোন স্থানে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারেনা; কারণ শাসকগোষ্ঠীর লোকেরা সব সময়ে তার গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখছে। তার গোত্রের অনেকেই এখন তার সাথে শত্রুতা করছে, এমনকি এই শত্রুতা তার নিজের পরিবার দেখানো শুরু করে, তাতেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। তাকে তার ভিন্ন আক্বীদাহ্-র জন্য দোষারোপ করা হয়ে থাকে। আরো দোষারোপ করা হয় যে, তার কারণে তাদের নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটতে পারে এবং সে তাদের জন্য বিভিন্ন সমস্যার দরজা খুলে দিতে পারে। এভাবেই তার উপর একের পর এক মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হয়। নিঃসন্দেহে তাকে এ ধরনের আরো অনেক অদ্ভূত সমস্যায় জড়ানো হয়।

আর অন্যদিকে সেই ব্যক্তি যে ইহুদী, খ্রীষ্টান এবং তাওয়াগীতের (মুরতাদ শাসকদের) কুকর্মের ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকে আর বলে যে, এই তাওয়াগীতরা হচ্ছে আমাদের শাসক, যাদের বিরুদ্ধাচারণ জায়েয নয়। সম্ভবত, সেই ব্যক্তি আল্লাহ্ তা‘আলার সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবে না, এমন কি একদিনের জন্যও নয়। সে তাওয়াগীতদের থেকে নিরাপদ, সে যেখানে খুশি সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারবে এবং যেভাবে খুশি সেভাবে আয়-উপার্জন করতেও কোন বাধা প্রাপ্ত হবে না। এই ধরনের মানুষের উপর উল্লিখিত হাদীসের বৈশিষ্ট্য প্রযোজ্য হবে না, যাদেরকে আগন্তুক হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

আমরা কিভাবে এ ধরনের ব্যক্তিকে ‘আগন্তুক’ বলতে পারি যে সবার থেকে আলাদা হওয়ার বিষয়টি কি তা জানে না? এ পর্যন্ত হয়ত সে তাওয়াগীতদের পক্ষ থেকে অতি মর্যাদা পেয়ে আসছে। অনেক ধরনের সুযোগ-সুবিধাই তাকে দেয়া হয় যা অন্য কেউকে দেয়া হয় না। যেমনঃ এ সকল দা’য়ীদের কোন ধরনের তিক্ত অভিজ্ঞতা, বন্দীত্ব অথবা নজরদারীর ঝামেলা নেই,বরং তাদের নিরাপত্তা এবং গাড়ী দেয়া হয়।অন্যদিকে, কিছু মানুষ ঘর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হচ্ছে এবং তারা তাদের সমস্থান, পিতা-মাতা, স্ত্রী, নিজের ভূমি এবং আরামদায়ক বাসস্থান সব কিছুই শুধু ইসলামের জন্য ত্যাগ করছে। কতই না ব্যবধান তাদের এবং এদের মধ্যে!

এটি কোন বাড়াবাড়ি অথবা চরমপন্থা নয়, বরং আমরা বলবো যে, আমরা এমন একটি সময়ে অবস্থান করছি, যখন

ইহুদী এবং খ্রীষ্টানরা সম্মিলিতভাবে ইসলামের ভূখন্ডের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে এবং তাওয়াগীতদের সাহায্য-সহযোগিতা করছে। আর এসব তাওয়াগীতরা তাদেরকে তেল, খাদ্য সরবরাহ করছে, কূটনৈতিক পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে এবং আকাশসীমা, জলসীমা এবং স্থলসীমার মাধ্যমে তাদেরকে নিরাপত্তা দিচ্ছে। তারা মুজাহিদীনদের সাথে যুদ্ধ করার মাধ্যমে তাদেরকে নির্মূল করার চেষ্টা করছে। আমরা বসবাস করছি এমন একটি সময়ে, যখন তারা আল্লাহর আইনকে পরিবর্তন করে তাঁর আইনের সমালোচনাকারী নিকৃষ্ট মানবরচিত আইন দিয়ে প্রতিস্থাপন করছে। যে কেউ উপরে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিবে, তাকে অবশ্যই সবার থেকে আলাদা হয়ে থাকতে হবে। অন্যদিকে, যে এগুলোকে প্রতিরক্ষা করবে অথবা এ সকল অবস্থা দেখার পরেও চুপকরে থাকবে, সে অবশ্যই এই আগন্তুক মানুষদের কেউ হতে পারে না, যদিও সে ইসলামের সেবায় অন্যান্য ভাল কাজে নিয়োজিত থাকে। কারণ যারা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করছে তথা মুজাহিদীনগণ ঐ মানুষদের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার যোগ্য, যাদের কথা এই হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, "তাদের অবস্থা হবে জ্বলন্ত কয়লা হাতে রাখার মত"।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা আপনার প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করুন। লক্ষ্য করুন, ইনসাফ এবং ন্যায় পরায়ণতার সাথে ঐ সমসস্ত ইসলামিক দলগুলোর দিকে, অতঃপর আপনি বুঝতে পারবেন বর্তমানে কারা সবচেয়ে নিকটবর্তী, যাদের কথা এই হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "তাদের অবস্থা হবে জ্বলন্ত কয়লা হাতে রাখার মত"। এই হাদীসটি আগন্তুক এর হাদীসটিকে আরো মজবুত করে।

মুজাহিদীনদের সাহায্যকারী দিনের পরদিন কমছে আর তাদের শত্রুরা শক্তিশালী হচ্ছে। আর তাদের শত্রু হচ্ছে ইহুদী, খ্রীষ্টান, তাদের দালাল (শাসকগোষ্ঠী) এবং একইভাবে শাসকদের কেনা আলেমগণ। এছাড়াও অনেক সময় সত্যনিষ্ঠ কিছু আলেমগণের পক্ষ থেকেও মুজাহিদীনদের উপর কিছু ভুল ইস্তিহাদের[1] দোষারোপ করা হয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও, মুজাহিদীনগণ সত্যনিষ্ঠ আলেমদের এবং ঈমানদারদের মধ্য থেকে যারা ফিত্রাহর উপরে আছে তাদের পক্ষে দাঁড়ায়। ইহুদী, খ্রীষ্টান, মুনাফিক এবং শাসকগোষ্ঠীর নিযুক্ত আলেমদের মিথ্যা প্রচারণা ও ভুল তথ্য পরিবেশনের কারণে ঈমানদারদের মধ্য থেকে অনেকেই মুজাহিদীনদের ব্যাপারে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে থাকে। একদিকে মুজাহিদীনদেরকে এমন কাজের জন্য দোষারোপ করা হয় যা তারা আদৌ করেনি, অন্যদিকে, মুজাহিদীনদের বিজয়ের অথবা শত্রু বাহিনীর পরাজয়ের খবর তারা গোপনকরে রাখে। এ ধররেন মিথ্যা প্ররোচণা তারা তাদের মিডিয়ার মাধ্যমগুলো দ্বারা খুব সততার সাথে সম্প্রচার করে থাকে। এ বিষয়টির জন্য আলাদাভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন।

আল্লাহ্ আপনাকে হিফাযত করুন। লক্ষ্য করুন, মুজাহিদীনরা যখন দেখছে আল্লাহর কালেমাকে অবমাননা করা হচ্ছে, অত্র বার্তার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করা হচ্ছে, তখন তারা আল্লাহর পথে বের হয়ে পড়ছে এবং তারাই হচ্ছে সেই মুজাহিদ যারা তাদের জান ও মালকে আল্লাহ্ও পথে কুরবানী করছে। এভাবে তারা দুনিয়াবী সকল আরাম-আয়েশকে ত্যাগ করে পুরোপুরি আল্লাহর নিকট নিজেকে আত্মসমর্পন করে দিচ্ছে। ফলশ্রুতিতে, তাদের জন্য নিরাপদ ভূমিহয়ে যায় ভীতিকর স্থানে, স্বচ্ছলতা দারিদ্যতায় পরিণত হয় এবং আল্লাহতা'আলার এই জমীনে পরিভ্রমণ করার পথ গুলো ধীরে ধীওে সংকীর্ণ হয়ে আসতে থাকে। এত কিছুর পরেও, তাদের উপরে এই অভিযোগ আনা হয় যে, তাদের আক্বীদায় ত্রুটি রয়েছে এবং তারা জনসাধারণের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখে না এবং এই উম্মাহর বিপর্যয়ের কারণ হচ্ছে তারাই। এটাই কি সেই মূহুর্ত নয়, যখন দ্বীনের উপর ইস্তেক্বামাত থাকা, জ্বলন্ত কয়লা হাতে রাখার মতই কঠিন? মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ (মানুষরা কি মনে করে নিয়েছে, তাদের এটুকু বলার কারণেই ছেড়ে দেয়া হবে যে, আমরা ঈমান এনেছি এবং পরীক্ষা করা হবে না?) [২৯ঃ ২]

সত্যিকার অর্থে, মুজাহিদীনরা হচ্ছেএমন সব মানুষ যাদেরকে সবসময় দুঃখ-কষ্টের দ্বারা আবৃত্ত থাকতে হয়। নিঃসন্দেহে,বর্তমানে যারা হক্কের পথে চলার চেষ্টা করছে, তাদেরকেই এ ধরনের দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। কারণ আমরা এমন একটি সময়ে বসবাস করছি যখন ইহুদী, খ্রীষ্টনদের বাতিল দ্বীনগুলো উজ্জীয়মান এবং তাদের নিযুক্ত মুরতাদ দালালগুলো মুসলিম ভূখন্ডের উপরে শাসক সেজে বসে আছে। তাই আমি আল্লাহর কসম দিয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করছিঃ কিভাবে সত্যের অনুসারীগণ এসকল বাতিলের বিরুদ্ধেহাত ও মুখের দ্বারা সম্পর্কোচ্ছেদ ঘোষণা করার পরেও নিরাপদ থাকতে পারবে? বাসত্মবতা হচ্ছে, যে যুগেই কেউ রাসূল ﷺ –এরএই পথের অনুসরণ করেছিল আর তাদের উপরে তখন

কুফ্ফারদের কর্তৃত্ব ছিল, তখনতারা তাদেরকে ক্ষতি সাধন করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছিল। সুতরাং, আমরা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছি, যারা কখনো এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় নি, তবুও নিজেদেরকে বিজয়ী দলের অন্তর্ভূক্ত বলে দাবী করছেঃ যদি তাদের এই পথ রাসূল ﷺ-এর অনুসৃত পথ হয়ে থাকে, তাহলে এই পথে অনিবার্য সেই সকল বাধা-বিপত্তিগুলো আসবেই যা এসেছিল আমাদের নবী ﷺ -এর উপর,যখন কুফ্ফাররা সেখানে কর্তৃত্বশীল ছিল নতুবা আপনি সেই সকল বাধা-বিপত্তির পথকে এড়িয়ে চলছেন। আর যদি তাই হয়, তাহলে আপনার মানহাজ যাচাই করা প্রয়োজন। আপনার মানহাজের দিকে ফিরে দেখুন এবং জেনে রাখুন, যে কোন দলই এরূপ বাধা-বিপত্তির সামনা-সামনি করছে না, তাদের অবশ্যই আবার ফিরে দেখা উচিত তাদের মানহাজের দিকে যেমনটি সৈয়দ কুতুব رحمه الله বলেছেন।

৩. তারা মিল্লাতে ইব্রাহীম অনুসরণ করতে পেরে সবচেয়ে বেশি আনন্দিত।

আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে হিফাযত করুন। জেনে রাখুন, মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে ইব্রাহীম -এর দ্বীনকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেনঃ (ইব্রাহীমের মিল্লাত থেকে কে বিমুখ হতে পারে, সে ছাড়া যে নিজেকে নির্বোধ প্রতিপন্ন করেছে?)[২ঃ ১৩০]

অতঃপর নির্বোধ হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে মিল্লাতে ইব্রাহীমের দ্বীনে বাধা দেয় আর ঈমানদার হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে সর্বদা শরী'আহ-র দিক নির্দেশনা অনুসরণ করে। আর যদি তা তার বিচার-বুদ্ধির সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তখন সে তার নিজের বিচার-বুদ্ধিকেই দোষারোপ করে। অতঃপর আমাদের এমন কোনবেমানান আইন-কানুন প্রয়োজন নেই আর না প্রয়োজন আছে এমন মোটা বুদ্ধিমানদের। এই পরিস্থিতিতে আমি বলবো যে, আল-কায়দার ভাইয়েরা মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসরণকরতে পেরে খুবই আনন্দিত। বিশ্বাস না হলে আমার প্রিয় ভাই ,আপনি আমাদের কাছে এসে তা দেখে যেতে পারেন। আল্লাহর শপথ! যদি আপনি একটু মনযোগের সাথে ভাবেন, আল্লাহ্ তা'আলা যা বলেছেন মিল্লাতে ইব্রাহীমের ব্যাপারে এবং আপনার জীবনে তাবাসত্মবায়ন করেন, তাহলে আপনিও সেই সত্যটি উপলব্ধি করতে পারবেন, যা আমি বলছি।

প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রত্যাখ্যানের ভীড় থেকে সতর্ক থাকুন এবং আমাদের কথার সাথে প্রতিধ্বণিত করুন যে ব্যাপারে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ (আর অবশ্যই তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে ইব্রাহীম ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ আমাদের কোন সম্পর্ক নেই তোমাদের সাথে এবংআল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদের সাথেও। আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করি। আর তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরতরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে রইল।)[৬০: ৪]

অতঃপর, এ বিষয়ে আমাদের জন্য উত্তম উদাহরণ হচ্ছে ইব্রাহীম এবং তাঁর অনুসারী ঈমানদারগণ যারা দূর্বল অবস্থায় ছিল; তাদেরকে আমাদের অনুসরণকরতে হবে। তাঁরা বিচ্ছিন্নতার ঘোষণা করেছিল ঐ সকল মিথ্যা মা'বুদদের এবংযারা সেগুলোর ইবাদত করত তাদের। এই বিচ্ছিন্নতার ঘোষণা করা হয়েছিল মিথ্যামা'বুদদের আগে ঐ সকল মানুষদের সাথে যারা মিথ্যা মা'বুদদের ইবাদত করত। এবিষয়ে কিছু আলেম বলেছেনঃ এর কারণ হচ্ছে একজন মানুষ হয়তবা এ সব মিথ্যা মা'বুদকে পরিত্যাগ করতে পারবে, কিন্তু তারা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যঐ সকল মানুষদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে না-ও পারে, যারা এ সব মিথ্যা মা'বুদদের ইবাদত করছে। ফলশ্রুতিতে, তারা ততদিন পর্যন্ত সত্যিকারের মিল্লাতেইব্রাহীমের অনুসারী হতে পারবে না, যতদিন পর্যন্ত না তারা ঐ সব মিথ্যা মা'বুদদের ইবাদতকারীদের সাথে আগে সম্পর্কচ্ছেদ করবে। তাদের সাথেসম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেয়ার জন্য (আমরা তোমাদেরকে মানি না) এতটুকু কথা বলাই যথেষ্ট নয়, বরং আল্লাহর পথে সাহায্যকারী এবং শয়তানের অনুসারীদের মাঝখানে একটি সুস্পষ্ট সীমারেখা টেনে দিতে হবে (আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরতরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে রইল।) আর শত্রুতা ঘৃণার উপরে প্রধান্য পাবে, কারণ শত্রুতা বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায়এবং তা চলতে থাকবে, যতদিন পর্যন্ত না এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে হিফাযত করুন। লক্ষ্য করুন, কতই না সুন্দর মিল রয়েছে আল-কায়দার সাথে মিল্লাতে ইব্রাহীমের!

টীকাঃ
[1] সহীহ্ মুসলিম থেকে বর্ণিত।

সূত্রঃ বাংলায় অনূদিত ইন্সপায়ার ৫